জানুয়ারি ২০২১ ❑ পৌষ-মাঘ ১৪২৭

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

তাঁর প্রত্যাবর্তনে বিজয়ের পূর্ণতা

কাজী ইসতিয়াক ইসলাম ইফতি, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, ধানমণ্ডি গভ. বয়েজ হাই স্কুল, ঢাকা

সাবিহা তাসবীহ, ৭ম শ্রেণি, বি এ এফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

জানুয়ারি ২০২১ ❑ পৌষ-মাঘ ১৪২৭

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
মো. হুমায়ুন কবীর

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
মো. মাছুদ আলম

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সম্পাদকীয়

ছোট্ট বন্ধুরা, দেখতে দেখতে চলে গেল ২০২০ সাল। এসে গেল আরেকটি নতুন বছর ২০২১। আমরা আশা করব, যে উদ্যম আর আশা নিয়ে ২০২০ সাল শুরু হয়েছিল, ২০২১ সাল সে উদ্যম আর স্বপ্নকে আরোও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। তোমাদের সবাইকে জানাই ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

বন্ধুরা, নতুন বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিয়েছে নতুন ক্লাসের নতুন বই। । নতুন ক্লাসের নতুন বই পাওয়ার আনন্দই আলাদা তাই না ছোট্ট বন্ধুরা? নতুন বই পেয়ে তোমরা কিন্তু পড়াশোনা চালিয়ে যাবে ঠিকমতো।

১০ই জানুয়ারি ১৯৭২। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। এই দিন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগারের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে এসেছিলেন আমাদের মাঝে, এই প্রিয় বাংলায়। সেই বছরটা কী আনন্দ দিয়েই না শুরু হয়েছিল। সেই থেকে জানুয়ারি মাস ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

বন্ধুরা, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটের আঘাতে বঙ্গবন্ধু শহিদ না হলে এই বাংলাদেশকে তিনি কত উঁচুতেই না নিয়ে যেতেন। তাই বলে থেমে নেই সোনার বাংলার উন্নয়নের ধারা। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য সন্তান আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। সামাজিক-অর্থনৈতিক নানা ক্ষেত্রে দেশ আজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। মানুষের মাথাপিছু আয় দুই হাজার ডলার অতিক্রম করেছে। পদ্মার ওপর সেতু তৈরির বিষয়টি এক সময় ছিল কল্পনার অতীত, তা এখন বাস্তব। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু দেশের উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বহুদূর। অচিরেই পূরণ হবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন।

সবাই ভালো থেকো বন্ধুরা। তোমাদের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। ■

সূচি

নিবন্ধ

৩ নতুন বই জীবনের বাগানে আগামীর দোলা/মনি হায়দার
৭ প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে অ্যাপ/সানজিদ হোসেন
৮ তাঁর প্রত্যাবর্তনে বিজয়ের পূর্ণতা/বিশ্বজিৎ ঘোষ
১৩ বঙ্গবন্ধুর নামে জাতিসংঘ পুরস্কার/রাজিবুল আলম
১৪ ভার্চুয়াল বঙ্গবন্ধু শিল্পকর্ম প্রদর্শনী/আজমেরী সুলতানা
১৬ স্বপ্নের পদ্মা সেতু/শাহানা আফরোজ
২২ ঘুড়ি উৎসব: ঐতিহ্যে নতুন মাত্রা
কাজী আরিফুর রহমান
২৪ বাঁশখালীর মৃৎশিল্প/জুবাইর জসীম
২৭ আবার এল নতুন বছর/মেজবাউল হক
৩০ মজার ঋতু শীত/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৫৯ করোনা যোদ্ধা ঊর্মি/জান্নাতে রোজী
৬০ দশদিগন্ত/ সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
৬১ বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ
৬৩ বুদ্ধিতে ধার দাও ডিসেম্বর ২০২০ -এর সমাধান

ছোটোদের ছড়া

৫৫ গোলাম সাকলায়েন/ লাবিবা তাবাসসুম রাইসা
মো. তৈয়বুর রহমান ভূঁইয়া/ মিম আক্তার

ছোটোদের লেখা

৫২ ভূত সমাচার/শুচিস্মিতা ঘোষ
৫৩ স্মৃতিশক্তি বাড়ার কিছু উপায়
মো. তানভীর ইসলাম
৫৫ পছন্দের ছড়া/ইরাম আহমেদ
৫৬ উইকি লাভস আর্থ প্রতিযোগিতা -২০২০
রুবাইয়াত হোসেন

গল্প

৩৪ সাইকেল/আহসান হাবীব
৩৬ নতুন বইয়ের ঘ্রাণ/আব্দুস সালাম
৩৮ সময়ের অতিথি/নজরুল হাসান ছোটন
৪১ রাজকন্যার রান্না/মীম নোশিন নাওয়াল খান
৪৪ প্রজাপতির ডানা/অনুবাদ: মোস্তাফিজুল হক
৪৮ চড়ুইয়ের তৃষ্ণা/শাম্মী তুলতুল
৫০ তুষিমণির বেড়াতে যাওয়া/সারমিন ইসলাম রত্না

ভাষা দাদু

২৮ সম্ দিয়ে শব্দ যত/তারিক মনজুর

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবিতা

২৬ শাশ্বত ওসমান/ মাছুমা রহমান লিমা

কবিতাগুচ্ছ

১৯ মহিউদ্দিন বিন্ জুবায়েদ
৩৩ নীহার মোশারফ/ শাহ্ সোহাগ ফকির
খাইরুল ইসলাম ভূইয়া (শান্ত)/ ইমরান খান রাজ

বিজ্ঞান

৩২ পৃথিবী বদলে দেওয়া বিজ্ঞানী/অনিক শুভ

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : কাজী ইসতিয়াক ইসলাম ইফতি/সাবিহা তাসবীহ
২৩ আহনাফ কাদের
৩৬ আয়ান হক ভূঁঞা
৪৯ আকিব হোসেন
৫১ সানজিদা আক্তার রুপা
৬৪ মোহাম্মদ ইউসুফ তুর্য/ ইহসানুল হক সিফাত

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

নতুন বই
জীবনের বাগানে আগামীর দোলা

মনি হায়দার

গ্রামীণ সরিষা ক্ষেতের মাঠ। মাঠের মাঝখানে ঘাসে জড়ানো আঁকাবাঁকা আইল। আইল ধরে দৌড়াচ্ছে এক ঝাঁক ছেলে-মেয়ে। ওদের মুখ জুড়ে আকাশ ভরা হাসি। কারণ, ওদের হাতে নতুন বই। আগামীর পতাকার মতো বইয়ের পাতা ঢেউয়ে ঢেউয়ে দৌড়াচ্ছে না, উড়ে বেড়াচ্ছে। গোটা বাংলাদেশের আটষট্টি হাজার গ্রাম মেতে উঠেছে নতুন ধানের মতো নতুন বইয়ের নবান্ন উৎসবে। সেই উৎসবের উৎস আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। নতুন টাটকা বইয়ের ঘ্রাণে শিশুদের মন প্রাণ ভরে উঠছে ছন্দে।

দুই

করোনার প্রকোপে স্কুল বন্ধ মাসের পর মাস। পৃথিবীর সকল দেশের মতো বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েরা ঘরবন্দি। যে জীবন স্কুলের মাঠে, খেলার বাটে, এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতো, সেই মাঠ আর বাট বন্ধ অনেকদিন। স্কুলের ছেলে-মেয়েরাও বন্দি চার দেয়ালের মধ্যে। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন... সপ্তাহ, মাস পার হয়ে বন্দি জীবন প্রায় বছর ছুঁয়ে যায় যায়। বিমর্ষ জীবনের এই দোলাচলে গত দশ বছরের স্মৃতি আর উল্লাস নিয়ে ফিরে আসে ইংরেজি পহেলা জানুয়ারি, ২০২১ সাল।

সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায় বন্ধ দুয়ার, বন্ধ স্কুলের মাঠ– কারণ, নতুন বই। নতুন বই নতুন সাজে চলে এসেছে স্কুলে স্কুলে। চারদিকে, শহরে শহরে বন্দরে বন্দরে পড়ে গেছে বিপুল সাড়া। অনেকটা ঈদের উৎসব নিয়ে স্কুলের ছেলে-মেয়েরা সাজুগুজু করে স্কুলে পৌঁছে গেছে। স্কুলে গিয়ে দেখা হয়েছে গত কয়েক মাসে দেখা না হওয়া বন্ধুদের সঙ্গে। কত স্মৃতি আর কত গান...। স্মৃতি আর গানের সঙ্গে নতুন বইয়ের গন্ধ, বর্ণ আর ছবির মিছিলে ভরে যায় স্কুলের প্রাঙ্গণ, ২০২১ সালের প্রথম জানুয়ারি, বই উৎসবে।

তিন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১শে ডিসেম্বর, বছরের শেষ দিন আনুষ্ঠানিকভাবে বই বিতরণের কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন গণভবন থেকে ভার্চুয়াল যোগাযোগের মাধ্যমে। প্রতি বছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবনে ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন বছরে বই বিতরণের মহা উৎসব শুরু করতেন। কিন্তু এ বছর মহামারি করোনার কারণে তিনি ভার্চুয়াল মাধ্যমে বই বিতরণের কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন। করোনার কারণে মাঠ পর্যায়েও বই বিতরণের কার্যক্রমে ভিন্নতা আনা হয়েছে। কারণ, সবার আগে আমাদের ভবিষৎ নাগরিকদের জীবনের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। করোনার সময়ে যাতে ছাত্রছাত্রীদের বেশি ভিড় না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে স্কুলে স্কুলে, ক্লাসে ক্লাসে বই বিতরণের কাজ নেওয়া হয়েছে।

চার

বই বিতরণের জন্য স্কুলে স্কুলে আলাদা আলাদা বুথ তৈরি করা হয়েছে। বুথগুলো শ্রেণিভিত্তিক। প্রতিটি স্কুলের প্রতি ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট বুথ। প্রতিটি বুথে আবার একজন শিক্ষককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই শিক্ষক বুথে অপেক্ষা করছেন আর নতুন বইয়ের গন্ধে আকুল ছাত্রছাত্রীরা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে সারিবদ্ধভাবে বই গ্রহণ করেছে। ছাত্রছাত্রীরা এ ক্ষেত্রে দারুণ নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষার পরিচয় দিয়েছে। আমাদের ভবিষৎ নাগরিকেরা আসলে অনেক দায়িত্বশীল। পৃথিবীর এই মহামারির সময়ে স্কুলের ছেলে-মেয়েরা যে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে, তার তুলনা মেলা ভার। স্কুলগুলোর কর্তৃপক্ষ বেশ কয়েকদিন ধরে, পালাক্রমে বই বিতরণ করেছে। সারা দেশটা নতুন বইয়ের গন্ধে ভরে উঠেছে।

পাঁচ

করোনা ভাইরাসের আক্রমণ থেকে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের নিরাপদ রাখার জন্য অনেক স্কুলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক সরবরাহ করা হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের কাছে বই বিতরণের জন্য বারো দিন সময় পেয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ও শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২০২১ শিক্ষাবর্ষের স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন, ৩১শে ডিসেম্বর ২০২০- পিআইডি

গত কয়েক বছরে বই বিতরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলো চমৎকার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে মহামারির মধ্যেও যথাযথভাবে বইগুলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হলো। বাংলাদেশে এক অভিনব উচ্ছ্বাসমুখর আয়োজন করে বই উৎসব চলছে বছরের পর বছর। বাংলাদেশ সরকার গত ২০১০ সাল থেকে কোটি কোটি বই বিতরণ করছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীর কাছে। সেই হিসাবে এ বছর বিতরণ করা হয়েছে প্রায় ৩৫ কোটি বই। যা বিশ্বের বিস্ময়। সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রতিবছর বিনা মূল্যে বই পৌঁছে দেওয়ার ঘটনাই প্রমাণ করছে বাংরাদেশের শিক্ষার অগ্রগতি।

ছয়

বই বই আর বই। কত বই, সাদা-কালো বই। রঙে রঙিন বই। বইয়ের উৎসব তৈরি করতে কত কত বইয়ের আয়োজন করতে হয়েছে যে! বই কেবল বাঙালি শিশুদের জন্য বিতরণ করছে সরকার? না, সরকার তো দেশের সব মানুষের জন্য। সেই হিসেবে সরকার আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীদের জন্যও বই ছাপিয়েছেন। এটাও ব্যতিক্রমী বিস্ময়। বাংলাদেশ সব মানুষের... সব শ্রেণির শিশুদের। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির- চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও সাদ্রী ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঁচটি ভাষায় বই বিতরণের ব্যবস্থা করেছে। বই বিতরণে সরকারের আরো মহৎ উদ্যোগ রয়েছে। যেমন– দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরাও মানুষ এই সমাজ ও রাষ্ট্রের। ওদের আছে পড়াশুনা করার অধিকার। সেই চেতনাবোধ থেকে সরকার দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্যও ব্রেইল পদ্ধতির বই ছেপেছে। আমাদের দেশের প্রতিটি প্রান্ত বইয়ের আলোয় আলোকিত হবে, এই স্বপ্নকে ধারণ করে বই বিতরণের মধ্যে দিয়ে আমরা নতুন এক আলোর দুয়ারে পৌঁছে যাব।

সাত

বই পাওয়ার পর শিশুরা বিচিত্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছে হাসিমুখে। পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া উপজেলার বোথলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী অনিন্দিতা লাবণ্য বলেন, নতুন বইয়ের গন্ধটাই আসল। প্রথম

শ্রেণি থেকে নতুন বই পেয়ে আসছি এবং আমরা নতুন বইয়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকি।

কুমিল্লার দেবিদ্বারের প্রাথমিক স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র সুবল রায় জানায়, আমার বড়ো ভাইয়ের কাছে শুনেছি আগে বইয়ের জন্য ঠিকভাবে ক্লাস করতে পারত না। সবসময় সব বই কিনতেও পাওয়া যেত না। আর এখন আমরা বছরের প্রথম দিনেই বিনামূল্যে সব বই পেয়ে যাই...

মেহেরপুরের মুজিবনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী মিথিলা আখতার স্কুল মাঠে নতুন বইয়ের ঘ্রাণ নিতে নিতে প্রতিক্রিয়ায় জানায়, আমি এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকি, অনেকটা ঈদের দিনের অপেক্ষার মতো। আমাদের এই উৎসব আনন্দ উপহার দেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকার অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী অনুরিমা আহমেদ নতুন বই বুকের সঙ্গে জড়িয়ে হাসিমুখে বলেন, আজ বাংলাদেশ জুড়ে বই উৎসব। আমি এবং আমার বন্ধুরা অনেক অনেকদিন পরে বই নিতে এসে দেখা করলাম। গল্প করলাম। মনটা জুড়িয়ে গেল। আর নতুন বইয়ের গন্ধ তো পিঠাপুলির গন্ধের মতো। নতুন বইয়ের গন্ধ নেওয়ার জন্য বাসায় মা অপেক্ষা করছেন...।

সত্যি এমন উৎসব পৃথিবীর কোনো দেশে নেই। একমাত্র আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় বাংলাদেশেই আছে। আমরা গোটা বিশ্বে একটা অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছি।

আট

২০১০ সালের আগে বছরের শুরুতে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বই পেতে নানা ঝামেলা পোহাতে হতো। নগদ টাকা দিয়ে বই কিনতে চাইলেও অনেক সময়ে পাওয়া যেত না। পাওয়া গেলেও সেই বই মানসম্মত ছিল না। বইয়ের বাঁধাই হতো অযত্নে। বইয়ের ভেতরের ছবিও থাকত অস্পষ্ট। অনেক সময়ে বেশি দামেও বই কিনতে হতো।

বছর শুরু হয়ে গেছে, জানুয়ারিও চলে যায়, অথচ শিক্ষার্থীরা বই পাচ্ছে না, ক্লাসে যেতে পারছে না। বই বিক্রেতা ও ছাপাখানার মালিকদের অতি মুনাফার কারসাজিতে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা পড়ত বিপাকে।

সরকার এই বিপাক থেকে আমাদের কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের রেহাই দেওয়ার জন্য সরকারিভাবে বই ছাপানো ও ছাত্রছাত্রীদের কাছে বই পৌঁছে দেওয়ার প্রকল্প গ্রহণ করে। যদিও শুরুর বছরে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেছিল কিন্তু সরকারের ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় প্রথম বছরেই ২০১০ সালে বাংলার গ্রামে শহরের স্কুলে স্কুলে বই পৌঁছে দিয়ে সরকারের সক্ষমতার স্বাক্ষর রাখে। দশ বছরের সময় পার হয়ে বাংলাদেশের এই উদ্যোগ এখন বিশ্বে একটা মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নয়

পৌষ বা জানুয়ারির সঙ্গে বাঙালির পরিচয় শীতের, নতুন ধানের, নতুন চালের এবং নবান্ন উৎসবের। নতুন ধানের মহান উৎসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন বইয়ের। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই করে জাতির পিতার নেতৃত্বে যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আমরা পেয়েছি, সেই বাংলাদেশ আর গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে নানা সোপানে ও গৌরবে। সেই সোপান ও গৌরবের পাপড়িতে যুক্ত হলো, প্রতি ইংরেজি বছরের প্রথম দিন বাংলাদেশ জুড়ে বই বিতরণ উৎসবের। কবি লিখেছেন... এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি...। সত্যি গর্বে ও আনন্দে বুক ভরে যায়, নতুন বই আর নতুন ধানের গন্ধে...। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যখন নতুন বই হাতে লাল-সবুজের পতাকার নিচে গেয়ে ওঠে– আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি... প্রাণটা ভরে যায় নতুন বইয়ের সঙ্গে নতুন দিনের প্রত্যাশায়... ■

লেখক: কথাসাহিত্যিক, বাংলা একাডেমি

প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে অ্যাপ

সানজিদ হোসেন

স্কুলের বন্ধুরা শিফা নামেই ডাকে। পুরো নাম আরাবী বিনতে শফিক শিফা। সে ময়মনসিংহের ফুলপুর থানার আমরাকান্দা মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ছে ও। লেখাপড়ার পাশাপাশি তার রয়েছে কম্পিটারে বেশ দক্ষতা। ইন্টারনেট ব্রাউজার করতে গিয়ে জানেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পর্কে নানা তথ্য। আর তখনি তার মাথায় আসে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে অ্যাপ তৈরির ভাবনা। অবশেষে বানিয়ে ফেলল 'এক পলক শেখ হাসিনা' নামক অ্যাপ।

প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে অ্যাপ তৈরি সম্পর্কে আরাবী জানায় – বাবা সরকারি কর্মকর্তা হওয়ায় ফুলপুর উপজেলা পরিষদে বেড়ে ওঠা। পত্রিকা, ইন্টারনেট ব্রাউজিং করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ আর কল্পনা নয়, তাঁর বাস্তবমুখী পদক্ষেপ সারা বিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি পায়। প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণতায় বাংলাদেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। এসব কারণে দেশরত্ন শেখ হাসিনা সম্পর্কে জানতে ইন্টারনেট সার্চ করে এবং বিভিন্ন বই থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে এই অ্যাপটি তৈরি করি।

আরাবী আরো বলে– এই অ্যাপটির মাধ্যমে দেশের সকল মানুষ প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে সহজে জানতে পারবে। এছাড়াও সকল শিক্ষার্থীরাও জানবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য। এই অ্যাপের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ হলে তার এই ক্ষুদ্র জীবনটি সার্থক হবে। পরবর্তীতে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়েও অ্যাপ তৈরি করার ইচ্ছা আছে। ■

তাঁর প্রত্যাবর্তনে বিজয়ের পূর্ণতা

বিশ্বজিৎ ঘোষ

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম স্বদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে এক তাৎপর্যবাহী ঘটনা। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসেই সদ্য-স্বাধীন দেশের পরিপূর্ণ সরকার প্রকৃতপক্ষে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন আরম্ভ করে। তবে বাস্তব অর্থে বাংলাদেশ সরকারের গণতান্ত্রিক শাসন শুরু হয়েছিল ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি। ওই দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর দশ সদস্যের মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন। এরপর নানান চড়াই-

উতড়াই পেরিয়ে বাংলাদেশ আজ উপনীত হয়েছে সুবর্ণ জয়ন্তীর দ্বারপ্রান্তে। প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, প্রকৃত অর্থেই পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল।

উনিশ শ' একাত্তর সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যত কোনো সরকার তখন স্বদেশের মাটিতে ছিল না। বৈদ্যনাথতলায় শপথ গ্রহণকারী মুজিবনগর সরকার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে একাত্তর সালের ২২শে ডিসেম্বর। ১৬ থেকে ২২ তারিখ মধ্যবর্তী এই এক সপ্তাহ ছিল ভয়াবহ সংকটময় ও দুর্যোগপূর্ণ। দেশে তখন কোনো কেন্দ্রীয় প্রশাসন ছিল না। এসময় বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি গোষ্ঠী এবং শক্তির উদ্ভব ঘটেছিল, যাদের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার মতো প্রশাসনিক অবস্থা তখন দেশে ছিল না। বিজয়ের উল্লাসের পাশাপাশি চারিদিকে তখন বিরাজ করছিল চরম অনিশ্চয়তা। সরকারের সদস্য, প্রশাসন এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিয়ে ছিল শঙ্কা। শঙ্কা ছিল সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পদ নিয়েও। মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তিও নানা জায়গায় ঘাপটি মেরে বসেছিল–তাদের নিয়ন্ত্রণ করাও ছিল অতি দুরূহ অথচ অনিবার্য এক কাজ। এ সময় দ্রুতই দেশের মধ্যে নানা নামে অনেক বাহিনীর আত্মপ্রকাশ ঘটে–প্রয়োজন ছিল এদের নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণ। প্রয়োজনটা ছিল জরুরি, কিন্তু বাস্তবায়নটা ছিল অতি দুরূহ। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের নানা অঞ্চলে বিভিন্ন বাহিনী পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। বিজয়ের পর তাদের উপর একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে দেশে একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা ছিল তখন সময়ের দাবি। কিন্তু ভারত থেকে স্বদেশে ফিরে আসা মুজিবনগর সরকারের পক্ষে তা সহজ ছিল না। সামূহিক এই পরিস্থিতিতে গোটা জাতি সবচেয়ে বেশি অনুভব করেছে তাদের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতি। তিনি ফিরে না এলে দেশে কী পরিস্থিতির উদ্ভব হয়– তা কল্পনা করাও ছিল দুরূহ। এই অনিশ্চিত আতঙ্ক শিহরিত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং একই সঙ্গে বিজয়ের আনন্দে উদ্‌বেলিত জাতির কাছে ফিরে এলেন বাঙালির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেদিন সেই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সমগ্র জাতির চিত্তে এনে দিয়েছিল স্বস্তি, সাহস, ভরসা এবং স্বপ্নিল উন্নত ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা।

> উনিশ শ' একাত্তর সালের ২৫শে মার্চের মধ্যরাতের অব্যবহিত পরেই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। স্বাধীনতার ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন: 'This may be my last message, from to day Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved'

রেডিওগ্রামে স্বাধীনতার এই ঘোষণা দেওয়ার পরপরই পাকসেনারা বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুকে নির্মম নির্যাতন ভোগ করতে হয়। এক পর্যায়ে ইয়াহিয়া খান এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোর নির্দেশে কারাগারে প্রহসনমূলক বিচার করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের রায়ও দেওয়া হয়। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার উদ্দেশ্যে কারাগারে তাঁর দৃষ্টিসীমার মধ্যে কবর পর্যন্ত খোঁড়া হয়েছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পরিণতি, আন্তর্জাতিক চাপ এবং প্রায় এক লক্ষ পাকিস্তানি সৈন্যর কথা ভেবে বঙ্গবন্ধুর ফাঁসির রায় কার্যকর করা হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সরকারের অভ্যন্তরে নানা মতের দ্বন্দ্ব চলছিল, চলছিল গভীর ষড়যন্ত্র। খন্দকার মোশতাক ও তার সহযোগীরা এই মত প্রচার করছিল যে, একমাত্র আপোশ করেই

বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত করে আনা সম্ভব। যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছেও তারা এই মত প্রচার করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে মোশতাক চক্র বলেছে এইকথা–যুদ্ধ চালিয়ে গেলে হয়ত স্বাধীনতা অর্জিত হবে, কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে ফেরত পাওয়া যাবে না। মুক্তিযোদ্ধারা মোশতাক চক্রের মত মানতে পারেনি। তারা বলেছে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করবে এবং বঙ্গবন্ধুকেও ফেরত আনবে। পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো আপোশের প্রশ্নই আসে না। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের তাৎপর্য বলতে গিয়ে খুনি মোশতাকও তার অনুসারীদের এই ষড়যন্ত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হচ্ছে। কেননা একথা সহজেই বোঝা যায় যে, ১৬ই ডিসেম্বরে বাঙালির বিজয় এবং পাকিস্তানের পরাজয় মোশতাক চক্র মেনে নিতে পারেনি। অথচ সরকারে আছে তার দৃঢ় অবস্থান। এ অবস্থায় এই দুষ্টচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বঙ্গবন্ধু ভিন্ন অন্য কোনো বিকল্প সেদিন ছিল না। দেশকে ষড়যন্ত্র আর অস্থিতিশীলতার হাত থেকে মুক্ত রাখতে সেদিন বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প বাঙালি জাতি কল্পনা করতে পারেনি।

উনিশ শ' একাত্তর সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সে বিজয় ছিল অসম্পূর্ণ। বাহাত্তর সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয়ের পূর্ণতা লাভ করে। এ কারণে ১০ই জানুয়ারি 'জয় বঙ্গবন্ধু' আর 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে ঢাকাসহ বাংলাদেশ প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। বঙ্গবন্ধু যখন মৃত্যুঞ্জয় বীরের বেশে ঢাকায় অবতরণ করেন, তখন রাজধানীর আকাশ-বাতাস ছিল 'জয়বাংলা' ধ্বনিতে মুখরিত। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির হৃদয় সেদিন বঙ্গবন্ধুর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসায় উদ্‌বেলিত। ঢাকার মানুষ সেদিন সমবেত হয়েছিল বিমানবন্দর সড়কে– তেজগাঁও থেকে রেসকোর্স ময়দান কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। অগণন মানুষ শুধু তাদের প্রিয় নেতাকে এক পলক দেখার জন্য রাস্তায় অপেক্ষমান। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দানে সেদিন বঙ্গবন্ধুর গাড়ি বহরের সময় লেগেছিল সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা– এমনই ছিল জনসমাবেশ। নয় মাসে

দেশের মাটি আর মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধুর সঞ্চিত ভালোবাসা তিনি আবেগ আর উচ্ছ্বাসে উদ্‌বেলিত হয়ে পড়েছিল। আবেগে তিনি সে মুহূর্তে বাকশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন–শিশুর মতো ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। যে রেসকোর্স ময়দান উনিশ শ' একাত্তরের ৭ই মার্চ শুনেছিল সিংহ পুরুষের গগন ফাটানো বজ্রকণ্ঠ, সেই রেসকোর্সই বাহাত্তরের ১০ই জানুয়ারি শুনল আবেগ-উচ্ছ্বাসে মুহ্যমান এক শিশুর ক্রন্দনধ্বনি। ঢাকায় আসার পথে দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন, তা ছিল অসামান্য স্ফটিকসংহত এক ভাষণ। সেখানে আবেগ বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ রুদ্ধ করতে পারেনি। তিনি বলেছিলেন:

অবশেষে আমি নয় মাস পর আমার স্বপ্নের দেশ সোনার বাংলায় ফিরে যাচ্ছি। এ নয় মাসে আমার দেশের মানুষ শতাব্দীর পথ পাড়ি দিয়েছে। আমাকে যখন আমার মানুষদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তখন তারা কেঁদেছিল; আমাকে যখন বন্দি করে রাখা হয়েছিল, তখন তারা যুদ্ধ করেছিল, আর আজ যখন আমি তাদের কাছে ফিরে যাচ্ছি, তখন তারা বিজয়ী। আমি ফিরে যাচ্ছি তাদের নিযুত বিজয়ী হাসির রৌদ্রকরে। আমাদের বিজয়কে শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করার যে বিরাট কাজ এখন আমাদের সামনে তাতে যোগ দেওয়ার জন্য আমি ফিরে যাচ্ছি আমার মানুষের কাছে।

আমি ফিরে যাচ্ছি আমার হৃদয়ে কারো জন্য কোনো বিদ্বেষ নিয়ে নয়, বরং এ পরিতৃপ্তি নিয়ে যে অবশেষে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের, অপ্রকৃতিস্থতার বিরুদ্ধে প্রকৃতিস্থতার, ভীরুতার বিরুদ্ধে সাহসিকতার, অবিচারের বিরুদ্ধে সুবিচারের এবং অশুভের বিরুদ্ধে শুভের বিজয় হয়েছে।

পালাম বিমানবন্দরে দেওয়া চিন্তা ও ভাষার এই সংহতি বাংলার মাটি আর মানুষের কাছে গিয়ে রেসকোর্সের ভাষণে অসংলগ্ন হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছেন, 'আমি আজ বক্তৃতা দিতে পারবো না।' তবু সেদিনের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ছিল দিক-নির্দেশনামূলক। দু'একটি তাৎপর্যবাহী বক্তব্য এখানে প্রনিধানযোগ্য:

ক. আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোন ধর্মীয়ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।

খ. আমার সঙ্গে দিল্লিতে শ্রীমতী গান্ধীর আলাপ হয়েছে। আমি যখনই বলব, ভারতীয় সেনাবাহিনী তখনই দেশে ফেরত যাবে। এখনই আস্তে আস্তে অনেককে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

গ. গত ২৫শে মার্চ থেকে এ পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ মাসে বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এ দেশের প্রায় সব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে। তারা আমার মানুষকে হত্যা করেছে। হাজার হাজার মা-বোনের সম্ভ্রমকে নষ্ট করেছে। বিশ্ব এসব ঘটনার সামান্য কিছুমাত্র জানে। বিশ্বকে মানব-ইতিহাসের জঘন্যতম কুকীর্তির তদন্ত অবশ্যই করতে হবে। একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বর্বর পাকবাহিনীর কার্যকলাপের সুষ্ঠু তদন্ত করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি দিক-নির্দেশনাই ছিল গভীর তাৎপর্যবহ ও তাঁর স্বচ্ছ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয়বহ। ১০ই জানুয়ারির ভাষণে আবেগের স্পর্শ থাকলেও, তা ছিল বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতায় শানিত, জীবনদর্শনে সিক্ত। একথা অনস্বীকার্য যে, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ণতা লাভ করে। এক কোটি শরণার্থীর প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন, যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশকে নতুন করে গড়ে তোলা, লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে মৌখিক আহ্বানের মাধ্যমে অস্ত্র ফেরত নেওয়া এবং ভারতীয় সৈন্যদের ফেরত পাঠানো এসব জটিল প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সামাল দেওয়া সম্ভব হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কারণে। প্রসঙ্গগত স্মরণ করা যায় বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তনের তাৎপর্য সম্পর্কে এস এ মালেকের অভিমত:

বঙ্গবন্ধু ফিরে না এলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পরিণতি যে কি হতো বলা কঠিন। মিত্র বাহিনী যদি এত তাড়াতাড়ি বাংলার মাটি ছেড়ে না যেত তাহলে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির অপপ্রচার বাস্তবতায় রূপান্তরিত হতো এবং তারা সুযোগ নিত। লাখ লাখ সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা হয়তো রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে দিত এবং মিত্র বাহিনীর অবস্থান অনিবার্য করে তুলত। একদিন যার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, মরণপণ লড়াই করে দেশ স্বাধীন করল তারই নির্দেশে মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র জমা দিয়ে ব্যক্তিগত পেশায় ফিরে গিয়েছিল।

...তিনি প্রত্যাবর্তন না করলে দেশের অবস্থা যে কী হতো তা ভাবলেও আতঙ্কিত হতে হয়।

ভিন্ন একটি প্রসঙ্গের কথা এখানে উল্লেখ করতে হয়। বঙ্গবন্ধু কি জানতেন পাকিস্তানের প্রশাসন তাঁকে হত্যা করার সাহস রাখে না? বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই এবং তিনিও যথাসময়ে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পাবেন। তাই দেশকে কীভাবে তিনি গড়ে তুলবেন, কীভাবে পরিচালিত হবে তাঁর সরকার, রাষ্ট্রের আদর্শই বা কী হবে–কারাগারে এসব নিয়েই কি ভেবেছেন? একথা সকলেই জানি যে, বঙ্গবন্ধু এমনই এক নেতা, যিনি মৃত্যুকে ভয় পান না। তাই পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর না গুণে, বোধ করি, বঙ্গবন্ধু তৈরি করেছিলেন বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। তা না হলে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একটি নতুন দেশের শাসন পদ্ধতি ও গণতন্ত্রের গতিপথ কীভাবে নির্ধারণ করে দিলেন? বাহাত্তর সালের ১১ই জানুয়ারি সাংবাদিক এ বি এম মূসার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর কথোপকথন এবং এ প্রসঙ্গে তার (এ বি এম মূসা) ব্যাখ্যা এখানে স্মরণযোগ্য:

বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় (১১ই জানুয়ারির সকাল) আমাকে বলেন, 'শোন, আমি পার্লামেন্টারি সিস্টেম চালু করছি। একটু আগে তাজউদ্দিন আর মোশতাক এসেছিল, তাদের সব বলেছি। বিকেলে প্রেস কনফারেন্সে বিস্তারিত বলব। সবাই থাকিস।' ...সংবাদ সম্মেলনেই ঘোষণা করলেন তাঁর নতুন শাসনব্যবস্থা, সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রাপথ। ...পাকিস্তানের জেলখানায় দিন যাপনকালে তিনি কি সর্বক্ষণ স্বাধীন বাংলাদেশের শাসন প্রদ্ধতি ও প্রশাসন কাঠামোর ছক তৈরি করেছিলেন? তাই তো রেসকোর্সের ময়দানে বলেছিলেন, 'আমি জানতাম, আমার বাংলা একদিন স্বাধীন হবেই। সেই বাংলায় আমি আবার আসিব ফিরে।' তা না হলে দেড় দিনের মধ্যেই কী করে একটি প্রশাসনিক কাঠামো তৈরির তাৎক্ষণিক কতিপয় পদক্ষেপ নিলেন? পরদিন ১২ই জানুয়ারি সকালে বঙ্গবন্ধু প্রশাসনিক চমক দিলেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে আমলাদের পরিবর্তে নিয়োগ দিলেন পেশাজীবীদের।

উনিশ শ' বাহাত্তর সালের ১০ই জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানের ভাষণে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রের ভিন্ন একটা প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন। সেই ভাষণে তিনি বলেন:

> 'আমি ফিরে আসার আগে ভুট্টো সাহেব অনুরোধ করেছেন দুই অংশের মধ্যে বাঁধন সামান্য হলেও রাখা যায় কিনা। আমি তখন বলেছিলাম, আমি আমার মানুষের কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না। আজ আমি বলতে চাই–ভুট্টো সাহেব, আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সাথে আর না। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তাঁর প্রাণ দেবে। বাঙালি আর স্বাধীনতা হারাতে পারবে না।'

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন না হলে কী ঘটতো বাংলাদেশের ইতিহাসে তা বলা দুরূহ। তবে মোশতাকচক্র আর তার অনুসারীরা যে ভুট্টোর নির্দেশনা অনুযায়ী পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি কনফেডারেশন সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করত– সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে সে–সম্ভাবনা ধূলায় মিলে যায়, জুলফিকার আলী ভুট্টো-ইয়াহিয়া খানের শেষ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

উনিশ শ' বাহাত্তর সালে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য এক ঘটনা। আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর পর বাংলাদেশের যে অগ্রগতি, তার বীজ রোপিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং সে-উপলক্ষে রেসকোর্স ময়দানে তাঁর দেওয়া ভাষণে। দেশ আর দেশের মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভালোবাসা ছিল কিংবদন্তিতুল্য। দেশের মানুষকে তিনি ভালোবাসেন– এটাই তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো গুণ; আবার এটাই তাঁর চরিত্রের বড়ো দুর্বলতা– একথা সাংবাদিক ডেভিডের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেছেন। উনিশ শ' বাহাত্তর সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি প্রথমেই দেশের মানুষের কাছে, বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে– দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পরিজনদের কাছে নয়। এখানেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশপ্রেম। এই আদর্শ নিয়েই বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন, বাঙালির চিত্তলোকে বেঁচে থাকবেন চিরকাল। ■

লেখক: গবেষক, প্রাবন্ধিক ও উপাচার্য, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ

নিবন্ধ

বঙ্গবন্ধুর নামে জাতিসংঘ পুরস্কার

রাজিবুল আলম

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর। এ মাসে পেয়েছি আমাদের সেরা অর্জন মাতৃভূমি বাংলাদেশকে। যাঁর সুনিপুণ নেতৃত্বে পেয়েছি প্রিয় স্বাধীন, সার্বভৌম একটি দেশ। তিনি হলেন আমাদের অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর অবদানের কথা বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। ঠিক এ বিজয়ের মাসেই তাঁকে নিয়ে আমরা পেয়েছি আরেকটি সুখবর। আর সেটি দিয়েছে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো। এ সংস্থাটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে চালু করেছে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার। যার নাম 'Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize in the field of Creative Economy' পুরস্কার। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তনের সিদ্ধান্তের নথিটি ইউনেস্কো'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।

ইউনেস্কো শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ নানা ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সদস্য রাষ্ট্রসমূহের আর্থিক সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন করে থাকে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্যাতিমান ব্যক্তি তথা প্রতিষ্ঠানের নামে ২৩টি ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তিত রয়েছে। এই প্রথম বাংলাদেশের কোনো প্রথিতযশা সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ইউনেস্কো একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন করল। বঙ্গবন্ধুর নামে প্রবর্তিত পুরস্কারটি ২০২১ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য ইউনেস্কোর ৪১তম সাধারণ সভা চলাকালে প্রদান করা হবে।

ইউনেস্কো সদর দপ্তরে গত ২–১১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫৮ সদস্য বিশিষ্ট ইউনেস্কো নির্বাহী পরিষদের ২১০তম অধিবেশনের প্রথম পর্বের সমাপনী দিন তথা ১১ই ডিসেম্বর নির্বাহী পরিষদের প্লেনারি সেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এর আগে গত ৯ই ডিসেম্বর নির্বাহী পরিষদের যৌথ কমিটির সভায় প্রস্তাবটি ইউনেস্কোতে প্রাথমিকভাবে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এর পর ইউনেস্কোতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব কাজী ইমতিয়াজ হোসেন পরিষদের সকল সদস্য রাষ্ট্রকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এ সময় কাজী ইমতিয়াজ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবন শান্তি ও মানবতার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর শান্তির দর্শন 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়' বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর নামে মুজিববর্ষে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তনের ইউনেস্কোর এই সিদ্ধান্ত বৈশ্বিক শান্তি ও মানবতার প্রতি তাঁর অবদানের যথার্থ স্বীকৃতি। আমাদের জাতির পিতাকে সম্মানিত করে ইউনেস্কো বাঙালি জাতিকে সম্মানিত করেছে।

উল্লেখ্য, গত বছর ইউনেস্কোর ৪০তম সাধারণ সভায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন 'শতবার্ষিকী কর্মসূচির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে সংস্থাটি। মুজিববর্ষে এ পুরস্কার প্রবর্তনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে ইউনেস্কো সরাসরি সম্পৃক্ত হলো। এছাড়া, ইউনেস্কো ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড আন্তর্জাতিক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করে। ■

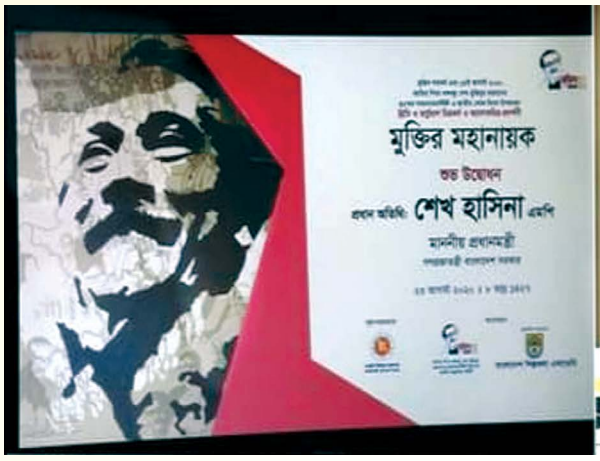

ভার্চুয়াল
বঙ্গবন্ধু শিল্পকর্ম প্রদর্শনী

আজমেরী সুলতানা

শেখ মুজিবুর রহমান এটি শুধু একটি নাম নয়, বাঙালির শত বছর লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা। বাঙালির মুক্তির মহানায়ক। তাঁর জন্ম ১৭ই মার্চ ১৯২০ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়। বাঙালির সভ্যতার আধুনিক স্থপতি হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা বলা হয়।

তিনি বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র ও স্বাধীনতা বিরোধী একদল নরপশুর হাতে সপরিবারে নারকীয় হত্যাকাণ্ডের শিকার হন এই মহানায়ক। তবে তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা দেশের বাইরে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান।

১৯৮১ সালে দেশে ফেরার পর তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে আওয়ামী লীগের সভাপতি হন তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতির পিতার 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহবানে ১৫ই আগস্টকে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করা হয় এবং আগস্ট মাসকে শোকের মাস হিসেবে স্মরণ করা হয়।

২০২০ সালটি বঙ্গবন্ধুর শতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি স্মরণীয় বছর। সালটিকে স্মরণীয় করে রাখতে নেওয়া হয় অনেক পদক্ষেপ। তাঁরই মধ্যে একটি হলো 'বঙ্গবন্ধু শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ২০২০'। ১৯৯৩ সাল থেকেই জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধু শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কিন্তু বৈশ্বিক মহামারী করোনার ক্রান্তিলগ্নে এই প্রদর্শনীটি অব্যাহত রাখার জন্য প্রথমবারের মতো গত ২৫শে আগস্ট ভার্চুয়াল শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর আয়োজন করে জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন পরিষদ। বৈশ্বিক মহামারীর এই সময়ে প্রদর্শনীটি অব্যাহত থাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

২০২০ সালে আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু শিল্পকর্ম প্রদর্শনী'র পুরস্কার বিতরণী ও আলোচনা সভাতে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রদর্শনীর উদবোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন তিনি। প্রদর্শনীর উদ্‌বোধক ছিলেন অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান (উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), প্রধান অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল, প্রধান আলোচক ছিলেন আব্দুল গাফফার চৌধুরী।

শিল্পকর্ম প্রদর্শনীটিতে প্রতিদিন নতুন শিল্পকর্ম ও বক্তব্য সংযোজন করা হয় যা ৩১শে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৩৪০টি চিত্রকর্ম ও ২৫০টি আলোকচিত্র প্রদর্শিত হয়, তবে প্রতিযোগিতায় ১০০টি চিত্রকর্ম উপস্থাপিত হয়। এতে ৫টি পুরস্কার প্রদান করা হয় যার মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধু পুরস্কার, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব পুরস্কার, শেখ রাসেল পুরস্কার, শেখ জামাল পুরস্কার ও শেখ কামাল পুরস্কার।

বঙ্গবন্ধু পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পকর্মটি একটি ভাস্কর্য, যাতে ভাস্কর্য লিটন পাল রনি বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি উপস্থাপন করেছেন। ভাস্কর্যটিতে শিল্পী আসনরত বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর চিন্তাশীল মুহূর্তগুলোকে আলোকিত করে তুলে ধরেছেন।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব পুরস্কারে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী আজমল হোসেনের অ্যাক্রেলিকে আঁকা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি বঙ্গবন্ধুর প্রতিবাদী কণ্ঠে দেওয়া ৭ই মার্চের বিখ্যাত ভাষণকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সেই ভাষণের মাধ্যমে বাঙালির মুক্তির মহানায়ক বাঙালিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করে। শিল্পী তাঁর চিত্রকর্মটির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর বিদ্রোহী রূপ তুলে ধরেছেন।

শেখ রাসেল পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী ওয়ালিউল বাসারও অ্যাক্রেলিকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি এঁকেছেন তবে তা কিছুটা ভিন্নভাবে। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় পশু রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে বঙ্গবন্ধুর সাথে স্থান দিয়েছেন, যার মাধ্যমে শিল্পী ৭ই মার্চের ভাষণকে বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির গর্জে ওঠাকে প্রকাশ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ যেন তাঁর গর্জে ওঠার মুহূর্ত, যা বাঙালিকে মুক্তির অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

এই শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে শেখ কামাল পুরস্কারপ্রাপ্ত হয় আরো একটি ভাস্কর্য, যা তৈরি করেছেন ভাস্কর্য অভিজিৎ কান্তি দাস। ভাস্কর্যটিতে শিল্পী চিন্তাশীল বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি তৈরি করেছেন।

শেখ জামাল পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পকর্মটি একটি ছাপচিত্র, যা এঁকেছেন শিল্পী রাকিব আলম শান্ত। ছাপচিত্রটিতে শিল্পী আসনরত বঙ্গবন্ধুর চিন্তায় নিমগ্ন প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন।

পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে আজ অবাধি যুগে যুগে এমন সব ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটেছে, যাদের হাত ধরে মানবতার মুক্তির সনদ রচিত হয়েছে । ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটারের এই ছোটো ভূখণ্ডটির জন্মের সাথে যার নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তিনি আর কেউ নন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যার আহ্বানে কোটি মানুষ প্রাণ বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেই মানুষকে কতিপয় নরপিশাচ ১৫ই আগস্ট হত্যা করে বাংলার মাটিকে কলঙ্কিত করে। এই ঘৃণ্য কাজের মাধ্যমে তাঁর স্বপ্নকে বিলীন করতে চেয়েছিল, কিন্তু তা সফল হয়নি। কারণ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সারথিরা আজও জেগে আছে। তাঁর স্বপ্ন পূরণে আজও দৃঢ় প্রত্যয় তারা।

শিল্প ও বঙ্গবন্ধুর শব্দ দুটি একে অপরের পরিপূরক। বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির শৈল্পিকতাই তাঁকে বিশ্ব দরবারে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। প্রতিবছর 'বঙ্গবন্ধুর শিল্পকর্ম প্রদর্শনী'-এর সফল আয়োজনের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পীরা জাতির পিতার প্রতি আনুগত্য এবং ভালোবাসা উভয়ই প্রকাশে সর্বাত্মক স্বাধীনতা পান। দেশের সর্বস্তরের খুদে, নবীন ও প্রবীন, অভিজ্ঞ শিল্পীরা তাদের শিল্পকর্ম উপস্থাপনের মাধ্যমে এই শিল্পকর্মের প্রদর্শনীর সৌন্দর্য বর্ধন করেন। তাদের শিল্পকর্মের মাধ্যমেই সর্বস্তরের মানুষ বঙ্গবন্ধুকে খুঁজে পান। জাতির পিতাকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অবিস্মরণীয় করার এই শিল্পকর্ম। তাই তো কবির ভাষায় বলতে হয়-

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান। ■

লেখক: শিক্ষার্থী, চারুকলা ও নকশা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

স্বপ্নের পদ্মা সেতু

শাহানা আফরোজ

স্বপ্ন ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নির্বাচনি ইশতেহারে যমুনা, বুড়িগঙ্গা, কর্ণফুলী, শীতলক্ষ্যা নদীর উপরে সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিলেও, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু পদ্মা নদীর উপর সেতু নির্মাণের ঘোষণা দেন। কিন্তু ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ায় পদ্মা সেতুর স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

অনেক চড়াই-উতরাইয়ের পর পূর্ণ অবয়ব পেয়েছে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের স্বপ্নের সেতুর মূল কাঠামো, যুক্ত হয়েছে পদ্মার দুই তীর। ১০ই ডিসেম্বর ২০২০, বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা ২ মিনিটে পদ্মা সেতুর টু-এফ নম্বর স্প্যানটি বসানো হয় মাওয়া প্রান্তের ১২ ও ১৩ নম্বর খুঁটির ওপর। যে ৪১টি স্প্যান বসিয়ে পুরো সেতু তৈরি হচ্ছে, এটি ছিল তার সর্বশেষ। এই স্প্যানটি বসানোর মধ্য দিয়েই সেতুর মূল কাঠামোর পুরোটা দৃশ্যমান হলো। স্বপ্ন সত্যি হলো। দিনের আলোয় চোখের সামনে ধরা দিল পদ্মা সেতু। এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হলো বাংলাদেশ, পুরো বিশ্ব।

সর্বশেষ স্প্যানটি বসানোর মধ্য দিয়ে পদ্মা সেতুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বড়ো কাজের সমাপ্তি হলো। এরপর সড়ক ও রেলের স্ল্যাব বসানো সম্পন্ন হলে সেতু দিয়ে যানবাহন ও ট্রেন চলাচল করতে পারবে। এতে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২৯ জেলার সঙ্গে সারা দেশের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হওয়ার পথ উন্মুক্ত হবে। পদ্মা সেতুর প্রথম স্প্যানটি খুঁটির ওপর বসেছিল ২০১৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর। বাকি ৪০টি স্প্যান বসাতে তিন বছর দুই মাস লাগল। করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি এবং বন্যার অত্যধিক স্রোত পদ্মা সেতুর কাজে কিছুটা গতি কমিয়ে দিয়েছিল। তবে গত ১১ই অক্টোবর, ২০২০ ৩২তম স্প্যান বসানোর পর অনুকূল আবহাওয়া পাওয়া যায়। কারিগরি কোনো জটিলতাও তৈরি হয়নি। ফলে টানা বাকি স্প্যানগুলো বসানো সম্ভব হয়।

সাধারণত সেতু স্টিলের অথবা কংক্রিটের হয়। কিন্তু পদ্মা সেতুটি হচ্ছে স্টিল ও কংক্রিটের মিশ্রণে। সেতুর মূল কাঠামোটা স্টিলের, যা স্প্যান হিসেবে পরিচিত। খুঁটি এবং যানবাহন চলাচলের পথ কংক্রিটের।

পদ্মার মূল সেতু, অর্থাৎ নদীর অংশের দৈর্ঘ্য ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার। অবশ্য দুই পারে আরও প্রায় চার কিলোমিটার সেতু আগেই নির্মাণ হয়ে গেছে। এটাকে বলা হয় ভায়াডাক্ট। এর মধ্যে স্টিলের কোনো স্প্যান নেই। দ্বিতলবিশিষ্ট পদ্মা সেতুর স্টিলের স্প্যানের ওপর দিয়ে চলবে যানবাহন। এই পথ তৈরির জন্য

কংক্রিটের স্ল্যাব বসানোর কাজ চলছে। সম্পন্ন হয়ে গেলে পিচঢালাই করা হবে। পুরো কাজ শেষ হলে যানবাহন চলাচলের পথটি হবে ২২ মিটার চওড়া এবং চারলেনের। মাঝখানে থাকবে বিভাজক। স্প্যানের ভেতর দিয়ে চলবে ট্রেন। সেতুতে একটি রেললাইনও থাকবে। তবে এর ওপর দিয়ে মিটারগেজ ও ব্রডগেজ দুই ধরনের ট্রেন চলাচলেরই ব্যবস্থা থাকবে। ভায়াডাক্টে এসে যানবাহন ও ট্রেনের পথ আলাদা হয়ে মাটিতে মিশবে।

২০১৫ সালের ১২ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হসিনা মূল সেতুর নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন। সেদিন তিনি বলেন, বড়ো কাজ করতে গেলে 'হাত পাততে হবে' এ মানসিকতা ভাঙতেই নিজস্ব অর্থায়নে দেশের সবচেয়ে বড়ো এই অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। 'আমি চেয়েছিলাম, আমরা পারি, আমরা তা দেখাব। আজ আমরা সেই দিনটিতে এসে পৌঁছেছি। বাঙালি জাতি কারও কাছে মাথা নত করেনি, করবেও না।'

২০১৪ সালের নভেম্বরে মূল সেতুর কাজ শুরু হয়। অবশ্য জমি অধিগ্রহণ, সংযোগ সড়ক নির্মাণ, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ও অবকাঠামো নির্মাণের কাজ এর আগেই শুরু হয়েছিল। মূল সেতু ও নদীশাসনের কাজ শুরুর পর অবশ্য নানা চ্যালেঞ্জ এসেছে।

কখনো পদ্মার ভাঙন, আবার কখনো কারিগরি জটিলতায় কাজ আটকে গেছে। পরিবর্তন করতে হয়েছে নকশায়। কিন্তু কাজ থেমে থাকেনি।

পদ্মা সেতু নির্মাণে ছিল বাধা, অর্থের সংস্থান নিয়েও অনিশ্চয়তা, দুর্নীতির ষড়যন্ত্র, বিশ্বব্যাংকের ঋণ প্রস্তাব বাতিল, দেশে- বিদেশে সমালোচনা। এসবের পাশাপাশি ছিল প্রাকৃতিক চ্যালেঞ্জও। তবে এত জটিলতার বিপরীতে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ছিল তাঁর নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস। সবকিছু উপেক্ষা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুন্সীগঞ্জের মাওয়ায় পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের মূল সেতু নির্মাণ কাজের উদ্‌বোধন করেন, ১২ই ডিসেম্বর ২০১৫ -পিআইডি

করে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে তাঁর স্বপ্ন এবং চ্যালেঞ্জের বাস্তবায়ন করেছেন। বাংলাদেশের এ অর্জন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ়তা, দূরদর্শী নেতৃত্বের সাক্ষ্য বহন করে। দেশের মানুষের স্বপ্নের পদ্মা সেতু শুধু মাত্র একটি অবকাঠামো নয়, এটা দেশের মানে আমাদের আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মান সক্ষমতা আর আত্মমর্যাদার প্রতীক। বাঙালির গর্বের আরেকটা নতুন সংযোজন।

স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মিত হলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাব নিয়ে সেতুর ডিজাইন পরামর্শক এক বিশ্লেষণে বা স্টাডি রিপোর্টে সেতুর বেনিফিট-কস্ট রেশিও (বিসিআর) ১ দশমিক ৭ এবং ইকোনমিক ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন (ইআইআরআর) ১৮ শতাংশ উল্লেখ করেন। তাছাড়া সেতু নির্মাণ ব্যয় যুক্ত হয়ে বিসিআর ২ দশমিক ১ এবং ইআইআরআর দাঁড়াবে ২২ শতাংশ। এর অর্থ হলো, এ সেতু নির্মাণ অর্থনৈতিক বিবেচনায় লাভজনক হবে। দক্ষিণাঞ্চলের ২৯টি জেলার সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগ দূরত্ব ২ থেকে ৪ ঘণ্টা কমে যাবে। এছাড়া–

- ব্যবসা-বাণিজ্য, নানা শিল্প গড়ে উঠবে,
- বার্ষিক জিডিপি ২ শতাংশ এবং দেশের সার্বিক জিডিপি ১ শতাংশের অধিক হারে বাড়বে,
- ভারত, ভুটান ও নেপালের সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপিত হবে।
- মংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দর সচল হবে। পর্যটনশিল্পের প্রসার ঘটবে এবং দক্ষিণ বাংলার কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত, সুন্দরবন, ষাট গম্বুজ মসজিদ, টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজার, মাওয়া ও জাজিরা পাড় দেশি-বিদেশি পর্যটকদের পদভারে মুখরিত হবে।

এক নজরে পদ্মা সেতু

- পদ্মা সেতুর প্রকল্পের নাম- পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প
- ধরন- দ্বিতলবিশিষ্ট
- নির্মাণ সামগ্রী- কংক্রিট ও স্টিল
- চুক্তিবদ্ধ কোম্পানির নাম- চায়না মেজর ব্রিজ কোম্পানি
- দৈর্ঘ্য- ৬.১৫ কিলোমিটার, তবে ডাঙার অংশ ধরলে এর দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় প্রায় ৯ কিলোমিটার।
- প্রস্থ- চারলেন সড়কের সেতুটির প্রস্থ ৭২ ফুট। মাঝখানে রোড ডিভাইডার
- নদীশাসন দুই প্রান্তে- ১২ কিলোমিটার
- সংযোগ সড়কের দৈর্ঘ্য- মাওয়া প্রান্ত ১৮ কিলোমিটার, জাজিরা প্রান্ত ১৪ কিলোমিটার
- ভায়াডাক্টের দৈর্ঘ্য- ৩.১৮ কিলোমিটার
- ভায়াডাক্ট পিলার- ৮১টি
- পাইলিং গভীরতা- ৩৮৩ ফুট
- পানির স্তর থেকে পদ্মা সেতুর উচ্চতা- ৬০ ফুট। পানির উচ্চতা যতই বাড়ুক না কেন, এর নিচ দিয়ে পাঁচতলার সমান উচ্চতার যে-কোনো নৌযান সহজেই চলাচল করতে পারবে
- প্রতি পিলারের জন্য পাইলিং- ৬টি। তবে মাটি জটিলতার কারণে ২২টি পিলারের পাইলিং হয়েছে ৭টি করে
- পদ্মা সেতুর মোট পাইলিং সংখ্যা- ২৬৪টি
- পদ্মা সেতুর পিলার সংখ্যা- ৪২টি
- স্প্যান বসেছে ১১৬৭ দিনে ৪১টি। প্রতিটি স্প্যানের দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার। ৪২টি খুঁটির সঙ্গে স্প্যানগুলো জোড়া দেওয়ার মাধ্যমে পুরো সেতু দৃশ্যমান হয়েছে
- একক রেললাইন স্থাপন করা হবে- নিচতলায়
- সেতুতে রেলপথ সংযুক্তির সিদ্ধান্ত হয়- ২০১১ সালের ১১ ই জানুয়ারি
- প্রকল্পে মোট ব্যয়- ৩০ হাজার ১৯৩.৩৯ কোটি টাকা
- ৪ঠা ২০২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে- ২৪ হাজার ১১৫.০২ কোটি টাকা
- নদীশাসন ব্যয়- ৮ হাজার ৭০৭ কোটি ৮১ লাখ টাকা
- রেল ছাড়াও আরও রয়েছে- গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অপটিক্যাল ফাইবার লাইন পরিবহন সুবিধা
- রাজধানী ঢাকার সাথে সংযোগ স্থাপন করবে- দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ২৯টি জেলার
- পদ্মা সেতু সংযোগ স্থাপন করেছে- মুন্সিগঞ্জের মাওয়ায় ও শরীয়তপুরের জাজিরায়
- কাজ শুরু হয়- ৭ই ডিসেম্বর, ২০১৪ সালে
- পদ্মা সেতুর প্রথম স্প্যান বসানো হয়- ২০১৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ■

পদ্মা সেতু

মহিউদ্দিন বিন্ জুবায়েদ

নদীর দেশে উঠল হেসে
পানির ওপর সেতু
লাল-সবুজের যেমনি ওড়ে
স্বাধীনতার কেতু।

সে তো আমার পদ্মা সেতু
রাঙা ঠোঁটের হাসি
জীবন মানের পালটে যাওয়া
ভালোবাসা-বাসি।

ওপার যারা এপার যারা
হলো কাছাকাছি
পদ্মা সেতুই স্বপ্ন দেখায়
মিলেমিশে বাঁচি।

দেশের সেতু দশের সেতু
ইতিহাসের পড়া
পদ্মা সেতু মানববন্ধন
জননেত্রীর গড়া।

পদ্মা সেতুর টুকিটাকি

রেকর্ড

- প্রথমটি সেতুর পাইলিং নিয়ে। পদ্মা সেতুর খুঁটির নিচে সর্বোচ্চ ১২২ মিটার গভীরে স্টিলের পাইল বসানো হয়েছে এসব পাইল তিন মিটার ব্যাসার্ধের। বিশ্বে এখনো পর্যন্ত কোনো সেতুর জন্য এত গভীরে পাইলিং প্রয়োজন হয়নি এবং মোটা পাইল বসানো হয়নি বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীরা। এছাড়া পদ্মা সেতুতে পাইলিং ও খুঁটির কিছু অংশে অতি মিহি (মাইক্রোফাইন) সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। এসব সিমেন্ট অস্ট্রেলিয়া থেকে আনা হয়েছে। এ ধরনের অতি মিহি সিমেন্ট সাধারণত ব্যবহার করা হয় না বলে জানিয়েছেন সেতু বিভাগের কর্মকর্তারা।
- দ্বিতীয় রেকর্ড হলো, ভূমিকম্পের বিয়ারিং সংক্রান্ত। এই সেতুতে 'ফ্রিকশন পেন্ডুলাম বিয়ারিংয়ের' সক্ষমতা হচ্ছে ১০ হাজার টন। এখন পর্যন্ত কোনো সেতুতে এমন সক্ষমতার বিয়ারিং লাগানো হয়নি। রিখটার স্কেলে ৯ মাত্রার ভূমিকম্পে টিকে থাকার মতো করে পদ্মা সেতু নির্মাণ হচ্ছে।
- তৃতীয় রেকর্ড নদী শাসন। নদী শাসনে চীনের ঠিকাদার সিনোহাইড্রো করপোরেশনের সঙ্গে ১১০ কোটি মার্কিন ডলারের চুক্তি হয়েছে। এর আগে নদী শাসনে এককভাবে এত বড়ো দরপত্র আর হয়নি।

ব্যতিক্রমী নদীশাসন

বিশ্বের অন্যতম খরস্রোতা নদী পদ্মা এবং এই নদীর তলদেশে মাটির স্তরের গঠন নিয়েও ছিল সংশয়। প্রথমদিকে পদ্মা নদীর তলদেশের মাটি খুঁজে পেতে বেগ পেতে হয় সেতু নির্মাণকারী প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞদের। তলদেশে স্বাভাবিক মাটি পাওয়া যায়নি। সেতুর পাইলিং কাজ শুরুর পরে সমস্যা দেখা যায়। প্রকৌশলীরা নদীর তলদেশে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় মাটি বদলে নতুন মাটি তৈরি করে পিলার গাঁথার চেষ্টা করে। স্ক্রিন গ্রাউটিং নামের এই পদ্ধতিতেই বসানো হয় পদ্মা সেতু। এরকম পদ্ধতির ব্যবহারের নমুনা বিশ্বে তেমন একটা নেই। এ প্রক্রিয়ায় ওপর থেকে পাইপের ছিদ্র দিয়ে কেমিক্যাল নদীর তলদেশে পাঠিয়ে মাটির শক্তিমত্তা বাড়ানো হয়েছে। তারপর ওই মাটিতে গেঁথে দেওয়া হয়েছে পিলার। এমন পদ্ধতির প্রয়োগ বাংলাদেশে এই প্রথম। গোটা বিশ্বেও এই পদ্ধতি প্রয়োগের নজির খুব একটা নেই। এ পদ্ধতিতে পাইলের সঙ্গে স্টিলের ছোট ছোট পাইপ ওয়েল্ডিং করে দেওয়া হয়। পদ্মার বুকে সেতু করা এত সহজ কাজ নয়। বরঞ্চ এটি একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয়। প্রতি সেকেন্ডে পদ্মা নদীতে ১ লক্ষ ৪০ হাজার কিউবিক মিটার পানি প্রবাহিত হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ এটিকে সফল হতে বাধ্য করেছে।

পদ্মার পরিচিতি

পদ্মা বাংলাদেশের প্রধান নদী। হিমালয়ে উৎপন্ন গঙ্গানদীর প্রধান শাখা এবং বাংলাদেশের তৃতীয় দীর্ঘতম নদী। তবে পৃথিবীর মধ্যে উত্তাল নদীর তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। পদ্মার সর্বোচ্চ গভীরতা ১,৫৭১ ফুট (৪৭৯ মিটার) এবং গড় গভীরতা ৯৬৮ফুট (২৯৫ মিটার)] এর দৈর্ঘ্য ৩৬৬ কিলোমিটার তবে বাংলাদেশে নদীটির দৈর্ঘ্য ১২০ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ১০ কিলোমিটার ।

সেরা আমাদের পদ্মা সেতু

প্রকৌশলীরা বলছেন, এক্সপ্রেসওয়ে আর সেতু একই জিনিস, তা স্থলভাগের ওপর দিয়েই যাক কিংবা জলভাগের ওপর দিয়ে। সে হিসেবে চীনের দানিয়াং-কুনশান গ্র্যান্ড ব্রিজ বিশ্বের দীর্ঘতম সেতু। তবে সড়ক ও রেলপথ একসঙ্গে চিন্তা করলে পদ্মা সেতু দৈর্ঘ্যের দিক থেকে বিশ্বের সেতুগুলোর মধ্যে প্রথম সারিতেই থাকবে।

ওপাড় গঙ্গা - এপাড় পদ্মা

ভারতে গঙ্গা নামে পরিচিত আর বাংলাদেশে পদ্মা। গঙ্গার ওপর নির্মিত সেতুর নাম মহাত্মা গান্ধী সেতু। ৫ দশমিক ৭৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সড়ক সেতুটি বিহারের পাটনার সঙ্গে উত্তরাঞ্চলীয় হাজিপুরকে যুক্ত করেছে। আর বাংলাদেশের পদ্মার ওপর নির্মিত সেতুর দৈর্ঘ্য ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার। এর মাধ্যমে যুক্ত হবে মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ের সাথে শরিয়তপুর ও মাদারীপুর জেলা।

পুরো সেতুর উচ্চতা সমান

পদ্মা সেতুটির মূল কাঠামোর উচ্চতা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় সমান। এর মূল কারণ, সেতুর ভেতর দিয়ে রেললাইন আছে। সড়ক ও রেললাইন একসঙ্গে থাকলে সেতু সাধারণত সমান হয়। না হলে ট্রেন চলাচল কঠিন হয়ে পড়ে। প্রকৌশলীরা জানিয়েছেন, পদ্মা নদীর পানির প্রবাহ পরিবর্তন হয়। কখনো মাওয়া প্রান্তে, কখনো জাজিরা প্রান্তে সরে যায়। আবার মাঝখান দিয়েও স্রোত প্রবাহিত হয়। নৌযান চলাচলের পথের জন্য সব স্থানেই সমান উচ্চতায় রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে সেতুটিতে।

হার্ডিঞ্জ সেতু আর পদ্মা সেতু

অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতে ১৮৮৯ সালে সরকার আসাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড ও উত্তরবঙ্গের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ সহজতর করার জন্য পদ্মার ওপর হার্ডিঞ্জ সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। পদ্মার পূর্ব তীর কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা এবং অপর পাশে পাবনার পাকশীকে যুক্ত করে এই সেতু। ১৯১৫ সালে ওই সেতুতে পরীক্ষামূলক ট্রেন চলাচল শুরু হয়। চালুর শতবর্ষ ছিল ২০১৫ সাল। আর বাংলাদেশ ২০১৪ সালে পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ শুরু হয় নিজেদের অর্থায়নে। প্রায় ১০০ বছরের ব্যবধান এ দুই সেতুর নির্মাণকাজের মধ্যে । পদ্মা সেতু দোতলা, ওপরে আছে সড়ক আর নিচে রেলপথ। হার্ডিঞ্জ সেতুতে কেবল রেলগাড়ি ও পথচারী চলাচলের ব্যবস্থা আছে। হার্ডিঞ্জ সেতুর দৈর্ঘ্য প্রায় ১ দশমিক ৮ কিলোমিটার। এটির স্ক্যানের দৈর্ঘ্য ১০৯ দশমিক ৫ মিটার। সেতুটিতে ইস্পাতের ১৫টি স্ক্যান আছে। আর নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু প্রায় ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার লম্বা। অর্থাৎ এটি হার্ডিঞ্জ সেতুর চেয়ে প্রায় ৩ দশমিক ৪ গুণ দীর্ঘ হবে। অবশ্য এই দুই সেতুরই মূল কাঠামো ইস্পাতের। ১০০ বছরের ব্যবধানে দেশের দুই সেতুর নকশা, নির্মাণ ও পদ্ধতিতে এসেছে পরিবর্তন, ছোঁয়া লেগেছে আধুনিক প্রযুক্তির।

পদ্মা সেতুর অবস্থান

পৃথিবীর বৃহত্তম সড়ক সেতুগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে বাস্তবায়নাধীন পদ্মা সেতুর অবস্থান ২৫তম বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তবে নদীর ওপর নির্মিত সব সেতুর মধ্যে দৈর্ঘ্যের দিক থেকে পদ্মা সেতুর অবস্থান প্রথম। সেতুর ফাউন্ডেশনের গভীরতার দিক থেকেও এর অবস্থান প্রথম।

ঘুড়ি উৎসব ঐতিহ্যে নতুন মাত্রা

কাজী আরিফুর রহমান

উৎসব প্রিয় বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। তবে ছয় ঋতুর মধ্যে শীত যেন আনন্দের ডালি নিয়ে আসে আমাদের জন্য। পিঠা-পুলি, বেড়ানো, ভ্রমণ, বনভোজন, চড়ুইভাতি, মেলা, প্রদর্শনী সব মিলিয়ে শীত আমাদের করে তোলে আত্মহারা। শীত যেন নবান্ন দিয়ে শুরু হয় আর ঘুড়ি উৎসবে শেষ হয়।

বাঙালির বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী পৌষ মাসের শেষ দিন পৌষ সংক্রান্তিতে পুরান ঢাকার বাসিন্দারা ঘুড়ি উৎসবের আয়োজন করে। উৎসবটি তাদের কাছে সাকরাইন উৎসব নামে পরিচিত। পুরান ঢাকায় ঘুড়ি উৎসবের শুরুটা কবে হয়েছিল তা হলফ করে বলা মুশকিল। তবে ঐতিহাসিকেরা বলেন, সতেরো শতকের নবাবি আমল থেকে পুরান ঢাকায় ঘুড়ি ওড়ানো উৎসবের শুরু। সে সময় উৎসবের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন নবাবেরা। পৌষের শেষ এবং মাঘের শুরুর ক্ষণে খাজনা আদায় শেষে নবাবরা ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসব করতেন। বাংলাদেশের প্রাচীন উৎসবসমূহের মধ্যে পুরান ঢাকার সাকরাইন উৎসব অন্যতম। পৌষ ও মাঘ মাসের সন্ধিক্ষণে, পৌষ মাসের শেষ দিন সারা ভারতবর্ষে পৌষসংক্রান্তি এবং ভারতীয় উপমহাদেশে মকর সংক্রান্তি হিসেবে উদযাপিত হয়। জনপ্রিয় এ উৎসবকে সংস্কৃতিতে ঐক্য এবং বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়।

সাকরাইন উৎসবের সকালের অংশে থাকে পিঠা-পুলিসহ নানা ধরনের মিষ্টি খাবারের আয়োজন। বিকেল বেলা আকাশে রং-বেরঙের ঘুড়ি ওড়ে। ছাদে কিংবা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘুড়ি ওড়ানো হয়। অধিকাংশ সময়ে ভোঁ কাট্টার (ঘুড়ি কাটাকাটি) প্রতিযোগিতা চলে। সূর্য ডোবার আগ থেকে শুরু হয় আলোকসজ্জা, আতশবাজি আর গানবাজনা। আয়োজনের কমতি না রাখতে প্রস্তুতি শুরু হয় অন্তত দুই সপ্তাহ আগে থেকেই।

পুরান ঢাকায় পৌষসংক্রান্তি বা সাকরাইন এখন শুধু ঢাকাইয়া উৎসব নয়, ছড়িয়ে পড়েছে সারাদেশে। দিনভর ঘুড়ি উড়ানোর পাশাপাশি সন্ধ্যায় বর্ণিল আতশবাজি ও ফানুসে ছেয়ে যায় সারা বাংলার আকাশ। বাংলা বর্ষপঞ্জিকার নবম মাস পৌষ মাসের শেষ দিনে আয়োজিত এ উৎসব বর্ষপঞ্জিকার হিসেবে জানুয়ারি মাসের ১৪ অথবা ১৫ তারিখে পালন করা হয়।

প্রতি বছরের মতো এ বছরও নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালন করা হয়েছে সাকরাইন উৎসব। তবে এবারে যোগ হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর আনন্দ। এ উপলক্ষ্যে প্রথমবারের মতো ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে একসাথে ৭৫টি ওয়ার্ডে আয়োজিত হয়েছে

সাকরাইন বা ঘুড়ি উৎসব। বিভিন্ন মাঠ ও বাড়ির ছাদ থেকে একসঙ্গে ১০ হাজার ঘুড়ি উড়েছে রাজধানীর আকাশে। উৎসবে অংশ নিতে আগ্রহীদের মাঝে এসব ঘুড়ি আগেই সরবরাহ করা হয়েছে। পৌষের শেষ দিন বৃহস্পতিবার ১৪ই জানুয়ারি দুপুর দুইটা থেকে শুরু হয়ে উৎসব চলে রাত ৮টা পর্যন্ত। 'এসো ওড়াই ঘুড়ি, ঐতিহ্য লালন করি' স্লোগানে এই উৎসব আয়োজন করা হয়। আকাশকে নানা রঙে বর্ণিল করে তুলেছিল পুরান ঢাকার শৌখিন মানুষেরা। একই সঙ্গে চোকদার, মাসদার, গরুদান, লেজলম্বা, চারভুয়াদার, পানদার, লেনঠনদার, গায়েলসহ প্রায় ২৬ ধরনের ঘুড়ির বৈচিত্র্যময় ডিজাইন ও রঙের বর্ণিলতায় মুখরিত হয়ে উঠে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরশনের ৭৫টি ওয়ার্ড।

রাজধানীর গেন্ডারিয়ার ধূপখোলা মাঠে ঘুড়ি উড়িয়ে গোটা আয়োজনের উদ্‌বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। শামীম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা বেনজীর আহমেদ, প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া প্রমুখ।

এ সময় তথ্যমন্ত্রী বলেছেন, দেশের ঐতিহ্য রক্ষায় আমাদের আবহমান বাংলার সংস্কৃতি ধরে রাখতে হবে। পুরান ঢাকার ঐতিহ্য তো বটেই, ঘুড়ি উৎসব পুরো বাংলাদেশের সংস্কৃতির অংশ। আমরা প্রায় সবাই ছোটোবেলায় ঘুড়ি উড়িয়েছি। কিন্তু জায়গার অভাবে এখন আমাদের কিশোর-তরুণরা ঘুড়ি উড়াতে পারে না। এই ঘুড়ি উড়ানোর যে কী আনন্দ-উত্তেজনা, যারা ঘুড়ি উড়াননি, তারা বুঝতে পারবেন না।'

উৎসবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বলেছেন, 'ঢাকাবাসীর ঐতিহ্যবাহী সাকরাইন উৎসবের মাধ্যমে ঢাকার পুরো আকাশকে আমরা রঙিন করে দিয়েছি। এই আয়োজনের মাধ্যমে আমরা বিশ্ববাসীকে জানাতে চাই আমরা আনন্দ করতে জানি। উৎসব করতে জানি। আমাদের ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করতে জানি। এখন থেকে প্রতি বছরই আমরা এই আয়োজন করব এবং আগামী বছরগুলোতে এই আয়োজনের কলেবর আরো বৃদ্ধি করা হবে।' ■

লেখক: প্রাবন্ধিক

আহনাফ কাদের, শ্রেণি: কেজি, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক স্কুল, ঢাকা

বাঁশখালীর মৃৎশিল্প

জুবাইর জসীম

চট্টগ্রাম জেলার সর্ব দক্ষিণের উপজেলা বাঁশখালী। সেই বাঁশখালীর ছয়টি গ্রামে কুমোর সম্প্রদায় বসবাস করে থাকেন। এ গ্রামগুলো হলো- সাধনপুর, পুর্ব কোকদন্ডি (রামদাস হাটের পূর্বে), কালীপুর, পূর্ব চেচুরিয়া, পূর্ব জলদী ও পূর্ব চাম্বল। লোকসংখ্যা প্রায় দুই হাজার।

তবে সরাসরি পেশার সাথে জড়িত আছে সাধনপুরে ৫/৬টি পরিবার, কালীপুরে ৫ পরিবার, জলদীতে ২টি পরিবার ও চাম্বলে ৩ টি পরিবার। বাকিরা পূর্ব পুরুষের পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় জড়িয়ে পড়েছে। তাদের বংশীয় পদবি রুদ্র। তাই কুমোর সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের নামের শেষে রুদ্র উপাধি লিখে থাকেন। তবে গ্রামাঞ্চলে কুমোর নামে সমধিক পরিচিত। এ জন্য গ্রামের মানুষ রুদ্র পাড়াকে কুমোরপাড়া বলে থাকে।

মৃৎশিল্পের প্রধান কাঁচামাল হলো পরিষ্কার এঁটেল মাটি। কাঠের চাকা, হাতের নৈপুণ্য, কারিগরি জ্ঞান, চুলা আরো ছোটোখাটো কিছু যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম এ কাজে ব্যবহৃত হয়। এক সময় কুমোরপাড়ার প্রত্যেক ঘরের পাশেই থাকত জিনিস পোড়ানোর চুলা। এই চুলা দেখতে উঁচু ছোট্ট ঢিবির মতো। এখন সম্মিলিতভাবে একটা-দুটো চুলা দেখা যায়। এই চুলায় মাটির তৈরি জিনিস পোড়ানো হয়। কুমোরেরা হাতের বিশেষ কৌশলে মাটির তৈরি সামগ্রী যেমন- হাঁড়ি, কলস, সরা, জালা, সানকি, পেয়ালা, মটকা প্রভৃতি জিনিস তৈরি করে থাকেন। এসব কাঁচা অবস্থায় প্রথমে সারিবদ্ধভাবে রোদে শুকাতে দেওয়া হয়। তারপর চুলার আগুনে পোড়ানো হয়।

বাঁশখালীর সবচেয়ে বড়ো কুমোরপাড়া কালীপুর গ্রামে। এটি বাঁশখালী প্রধান সড়কের কালীপুর ছফিরের দোকান হতে প্রায় এক কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত। এক সময় কালীপুরের মৃৎশিল্পের বেশ খ্যাতি ছিল। চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যবসায়ীরা এখান থেকে পাইকারি দরে তৈজসপত্র কিনে নিত।

কালীপুর কুমোরপাড়ার লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচশ। আগে সবকটি পরিবার এ পেশার সাথে জড়িত ছিল। এখন আছে মাত্র কয়েকটি পরিবার। তাদের প্রত্যেকের ঘরের সামনে একটি করে চুলা। কুমোরপাড়ার অদূরে

পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশে গর্ত করে ৩০/৪০ ফুট গভীর থেকে মাটি তুলে আনা হয়। সেই মাটি পানিতে ভিজিয়ে নরম করে দুরমুশ দিয়ে পিটিয়ে নরম খামির তৈরি করা হয়। সাথে লাল মাটি মিক্স করা হয়। এরপর কারিগর হাতের কৌশলে বিভিন্ন আঙ্গিকে হাঁড়ি-পাতিল তৈরি করে। ২/৩ দিন রোদে শুকানোর পর আগুনে পুড়াতে হয়।

একটা চুলায় ২৫০ থেকে ৫০০ পর্যন্ত হাঁড়ি-পাতিল পোড়ানো যায়। চুলায় হাঁড়ি-পাতিল বসানোর পর শুকনো খড়ের চাপড়া দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। চাপড়ার উপর টলটলে কাদা দিয়ে লেপুনি দিতে হয়। এই কাদা পুকুরের তলদেশ থেকে তোলা হয়।

কালীপুরের মৃৎশিল্পের এক সমৃদ্ধ জনপদ রয়েছে। মৃৎ মানে-মাটি আর শিল্প মানে সুন্দর সৃষ্টিশীল বস্তু। তাই মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে মৃৎশিল্প বলা হয়। এই শিল্প কর্মের সঙ্গে জড়িতদের বলা হয় কুমোর। কুমোররা অসম্ভব শৈল্পিক দক্ষতা ও মনের মাধুরি মিশিয়ে মাটির জিনিসপত্র তৈরি করেন। এক সময় বাংলার ঘরে ঘরে মাটির তৈরি বাসন-কোসন, হাঁড়ি-পাতিল, কলসি, ব্যাংক ইত্যাদি বানানোর প্রচলন ছিল। তখন এই পেশার ব্যাপক প্রসার ছিল। মাঝে মৃৎশিল্প কিছুটা পিছিয়ে গেলেও বর্তমানে এর চাহিদা অনেক।

গ্রামে পাড়া-মহল্লায় শীতকালে ভাপা পিঠার প্রচলন থাকায় পিঠা তৈরির অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ গুলো সাধারণত মাটির তৈরি। যেমন–মাটির তৈরি সরা, জালি, হাঁড়ি, রসের হাঁড়ি ইত্যাদি। গ্রামে একসময় পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও মাথায় করে এসব সামগ্রী ফেরি করে বেড়াত। বিশেষ করে বাঁশখালীর খানখানাবাদ, বাহারছড়া, সরল, গন্ডামারা ও ছনুয়া ইত্যাদি উপকূলীয় এলাকায় মাটির তৈরি তৈজসপত্রের ব্যাপক চাহিদা ছিল।

স্থানীয়রা মদাসমুন্সির হাটে প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবার মাটির তৈরি তৈজসপত্রের পণ্যের পসরা সাজিয়ে বাজার বসত। শীত এলে রসের হাঁড়ির কদর বেড়ে যেত। বাজারে থরে থরে সাজিয়ে রাখত রসের হাঁড়ি। সেই জৌলুস আবার ফিরে এসেছে, নানা ডিজাইনে নতুন আঙ্গিকে। ছোঁয়া লেগেছে আধুনিকতার।

সভ্যতার বিকাশ থেকে মৃৎশিল্প আবহমান গ্রামবাংলার গৃহস্থালী ব্যবহার্য তৈজসপত্রের চাহিদা মিটিয়ে আসছে। এ শিল্প আমাদের অহংকার। বাঙালির শত বছরের ঐতিহ্য এ শিল্পের সাথে মিশে আছে। আশার কথা হচ্ছে, বর্তমানে মাটির তৈরি তৈজসপত্র রান্নাঘর থেকে শুরু করে ডাইনিং টেবিলে এমনকি ড্রইংরুমেও শোভা পাচ্ছে। ■

লেখক: সাংবাদিক ও শিক্ষক

মুজিব মানে

শাশ্বত ওসমান

মুজিব মানে মুক্তিসেনা
যুদ্ধজয়ের গান
মুজিব মানে
বাংলাদেশের প্রাণ।
মুজিব মানে রক্তে লেখা খাম
মুজিব মানে
একটি স্বাধীন দেশের নাম।
মুজিব মানে
শ্বেত কপোতের ডাকা
মুক্ত আকাশে উড়তে
নেই তো মানা।
মুজিব মানে
পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বহমান
মুজিব মানে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু

মাছুমা রহমান লিমা

লাল-সবুজের পতাকায়
মিশে আছে প্রিয় একটি নাম
তিনি হলেন জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
তাঁর নেতৃত্বে পেয়েছি
স্বাধীন, সার্বভৌম একটি দেশ
বঙ্গবন্ধু মানেই আমাদের
সোনার বাংলাদেশ।

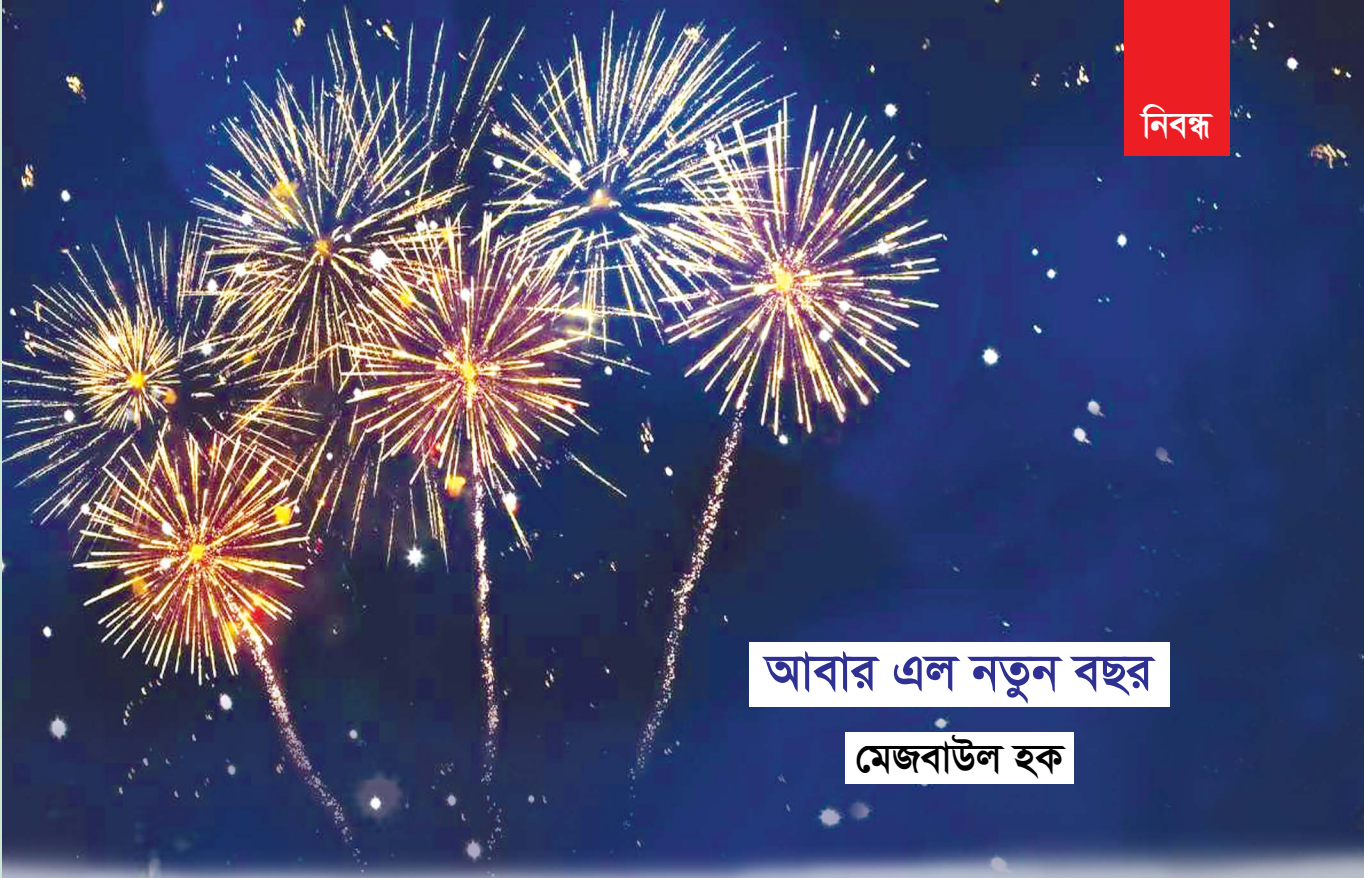

আবার এল নতুন বছর

মেজবাউল হক

ছোট্ট বন্ধুরা, ক্যালেন্ডারের শেষ পাতাটা উলটিয়ে চলে এলাম আরেকটি নতুন বছরে। আমাদের কাছ থেকে চলে গেল একটি বছর। আর আমরা পেলাম নতুন বছর ২০২১ সাল। সুখ-দুঃখ, পাওয়া-না পাওয়া, আশা-নিরাশাকে পেছনে ফেলে স্বাগত জানাই নতুন বছরকে আগামী দিনের নতুন স্বপ্ন রচনার জন্য। তাই তো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'বন্ধু হও, শত্রু হও, যেখানে যে কেহ রও/ ক্ষমা করো আজিকার মতো/পুরাতন বর্ষের সাথে/পুরাতন অপরাধ যত।'

বন্ধুরা, বাঙালি হিসেবে আমরা খুব ভাগ্যবান জাতি। আমরা বছরে দুবার বর্ষবরণ করে থাকি। একটি হলো পয়লা বৈশাখ, আর অন্যটি হলো ১লা জানুয়ারি। বাংলা নববর্ষে বলে থাকি 'শুভ নববর্ষ' আর ইংরেজি নববর্ষে বলে থাকি হ্যাপি নিউ ইয়ার। এই দুটি নতুন বছরের মধ্যে ব্যবধান হলো ঋতুতে। একটি শুরু হয় গ্রীষ্মকালে আর অন্যটি শীতকালে। এ দুটি বর্ষবরণ উদ্‌যাপনেও রয়েছে ভিন্নতা।

ইংরেজি নববর্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে পালন শুরু হয় ১৯ শতক থেকে। নতুন বছরের আগমনে বিভিন্ন দেশে উৎসবমুখর আমেজ সৃষ্টি হয়। বড়ো বড়ো স্থাপনা, হোটেল, রেস্তোরাঁ, রাস্তাঘাট নানা সাজে সজ্জিত করা হয়। এ বছর মহামারি করোনা ভাইরাসের মাঝে বিভিন্ন দেশে নববর্ষ পালন অব্যাহত থাকে। এ দিন উপলক্ষ্যে বিশ্বের নানা দেশে বছরের প্রথম দিনটি থাকে পাবলিক হলিডে। আর ৩১শে ডিসেম্বর রাত ১২টা এক মিনিট থেকেই শুরু হয়ে যায় নতুন বছর বরণের সকল আয়োজন।

নতুন বছর মানে নতুন ভাবে শুরু। বিগত বছরের সব গ্লানি মুছে দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ায় আমাদের সবার প্রত্যাশা। নিজেদের বিগত দিনের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনে নিজেকে সঠিকভাবে পরিচালনা করাই হোক নতুন বছরের ব্রত। সব ধরনের অস্থিরতা কাটিয়ে নতুন বছর আমাদের সবার জীবনে নিয়ে আসুক অনাবিল আনন্দ। নতুন আশার আলো ছড়িয়ে পড়ুক দিক থেকে দিগন্তে। ■

সম্ দিয়ে শব্দ যত

তারিক মনজুর

নেহাদের স্কুলে এবার বার্ষিক পরীক্ষা হয়নি। পরীক্ষা ছাড়াই সবাই নতুন ক্লাসে উঠেছে। নতুন ক্লাসের নতুন বই নেহা উলটিয়ে দেখছিল। সন্ধির অধ্যায়ে লেখা রয়েছে–

সংগীত= সম্ + গীত
সঞ্জয়= সম্ + জয়
সন্দেশ = সম্ + দেশ
সম্ভার =সম্ + ভার

নেহা বেশ অবাক হলো। সব কয়টা শব্দ ভাঙলেই সম্ পাওয়া যায়? সে বিনুকে ফোন দিল। বলল, 'ব্যাকরণ বইয়ে একটা মজার সমস্যা পেয়েছি। চলো, ভাষা-দাদুর বাসায় যেয়ে সমাধান করি।'

বিনু ফোনের মধ্যেই সব শুনল। বলল, 'আমার তো মনে হয়, এটা ছাপার ভুল। সব জায়গায় সম্ হয় কীভাবে?'

ওরা বই নিয়ে ভাষা-দাদুর বাসায় গেল। ভাষা-দাদু তখন গরম পানিতে লবণ দিয়ে গড়গড়া করছিলেন। বিনু আর নেহাকে দেখে বসতে বললেন। গড়গড়া করা শেষ হলে ওদের কাছে এসে বললেন, 'শীতের দিনে একটু সাবধানে থাকতে হয়।'

নেহা বলল, 'দাদু, তোমার কি ঠান্ডা লেগেছে?'

ভাষা-দাদু বললেন, 'ঠান্ডা লাগার পরে যেমন চিকিৎসা আছে, তেমনি ঠান্ডা-কাশি লাগার আগেও কিছু প্রস্তুতি আছে। এই ধরো, লবণ-গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করা, নাক দিয়ে গরম পানির বাষ্প নেওয়া, লেবুর রস আর মধু মিশিয়ে গরম পানি খাওয়া...'

বিনু বলল, 'দাদু, তুমি খুব নিয়ম মেনে চলো। সেজন্য এই বয়সেও এত ভালো আছো।'

'কিছু নিয়মের কোনো বয়স নেই। সবাই করতে পারে।' তারপর হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেলা এগারোটা বাজে। তা এ সময়ে কী মনে করে?'

নেহা বলল, 'বই পড়তে গিয়ে একটা সমস্যা পেয়েছি। বিনু বলছে, এটা ছাপার ভুল।'

'কই, দেখি, দেখি!' বলে ভাষা-দাদু বইটা হাতে নিলেন। খানিকক্ষণ উদাহরণগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'বুঝতে পেরেছি।'

বিনু বলল, 'এটা ছাপার ভুল, তাই না, দাদু?'

‘না, এটা ছাপার ভুল নয়। তবে এটা বোঝানোর জন্য কাগজ-কলম লাগবে।’ এই বলে দাদু টেবিলের ওপর থেকে কাগজ-কলম নিলেন।

বিনু বারবার নেহার দিকে তাকাতে লাগল। আকারে-ইঙ্গিতে কী যেন বোঝানোর চেষ্টা করল। ভাষা-দাদু এটা দেখতে পেয়ে বললেন, ‘কী, বিনু! কী হয়েছে?’

নেহা হেসে বলল, ‘দাদু, বিনু বোঝাতে চাচ্ছে, এটা খুব জটিল সমস্যা!’

বিনু লজ্জা পেয়ে বলল, ‘কই! কখন বললাম জটিল সমস্যা?’

‘দেখা যাক, সমস্যাকে সহজ করতে পারি কি না।’ এই বলে ভাষা-দাদু শুরু করলেন, ‘ক থেকে ম পর্যন্ত নাসিক্য ধ্বনি আছে পাঁচটি – ঙ, ঞ, ণ, ন, ম।’ এরপর কাগজে লিখলেন:

কণ্ঠ্য ধ্বনি: ক খ গ ঘ ঙ
তালব্য ধ্বনি: চ ছ জ ঝ ঞ
মূর্ধণ্য ধ্বনি: ট ঠ ড ঢ ণ
দন্ত্য ধ্বনি: ত থ দ ধ ন
ওষ্ঠ্য ধ্বনি: প ফ ব ভ ম

‘এর মানে, ঙ হলো কণ্ঠ্য-নাসিক্য ধ্বনি। ঞ হলো তালব্য-নাসিক্য ধ্বনি। ণ মূর্ধন্য-নাসিক্য ধ্বনি। ন দন্ত্য-নাসিক্য ধ্বনি। আর ম হলো ওষ্ঠ্য-নাসিক্য ধ্বনি।’

‘কিন্তু, দাদু,’ বিনু বলে, ‘আমাদের সমস্যা তো সম্ নিয়ে।’

দাদু বললেন, ‘এবার আসল কথায় আসি। সম্ একটি উপসর্গ। শব্দের আগে উপসর্গ বসে। শব্দের আগে উপসর্গ বসে নতুন শব্দ তৈরি করে। যেমন, গীত শব্দের আগে সম্ বসে তৈরি হয় সংগীত। জয় শব্দের আগে সম্ বসে তৈরি হয় সঞ্জয়। দেশ শব্দের আগে সম্ বসে তৈরি হয় সন্দেশ। ভার শব্দের আগে সম্ বসে তৈরি হয় সম্ভার।’

নেহা বলল, ‘তাহলে, বইতে ঠিক আছে। শব্দগুলো ভাঙলে সব ক্ষেত্রেই সম্ হবে। তাই তো?’

‘নেহা, তুমি তো ভাঙার কথা বলছো; আর তোমাদের স্কুলের পরীক্ষাতেও শব্দগুলো ভাঙতে বলে, মানে সন্ধি-বিচ্ছেদ করতে বলে। কিন্তু আমি ঠিক উলটো করে ভাবতে বলি।’ ভাষা-দাদু বলতে থাকেন, ‘উপসর্গ আসলে নতুন শব্দ তৈরির একটি প্রক্রিয়া। সংগীত, সঞ্জয়, সন্দেশ, সম্ভার – এগুলো সবই সম্ উপসর্গ দিয়ে তৈরি শব্দ।’

বিনু বলল, ‘শব্দগুলো দেখে বোঝাই যায় না, এদের ভিতরে সম্ আছে।’

দাদু বললেন, ‘এটা বোঝানোর জন্যই আমি কাগজ-কলম নিয়েছি। সংগীত শব্দে সম্ হয়ে গিয়েছে সঙ্ বা সং। সঞ্জয় শব্দে সম্ হয়ে গিয়েছে সঞ্। সন্দেশ শব্দে সম্ হয়ে গিয়েছে সন্। আর সম্ভার শব্দে সম্ সম্-ই আছে। এ রকম কেন হচ্ছে, জানো?’

‘কেন হচ্ছে?’ দুজনেই একসঙ্গে বলল। তারপর নেহা-বিনু দুজনের দিকে তাকিয়ে দুজনেই হেসে উঠল।

দাদু এবার কাগজের লেখা দেখিয়ে বললেন, ‘ক খ গ ঘ এগুলো কণ্ঠ্য ধ্বনি। এগুলোর আগে সম্ বসলে সঙ্ বা সং হয়ে যায়। চ ছ জ ঝ এগুলো তালব্য ধ্বনি। এগুলোর আগে সম্ বসলে সঞ্ হয়ে যায়। ত থ দ ধ এগুলো দন্ত্য ধ্বনি। এগুলোর আগে সম্ বসলে সন্ হয়ে যায়। প ফ ব ভ এগুলো ওষ্ঠ্য ধ্বনি। এগুলোর আগে সম্ বসলে সম্-ই থাকে। ...কিছু বুঝতে পারছ?’

বিনু বলল, ‘আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, দাদু!’ তবে নেহার মনে হলো, সে বুঝতে পারছে।

দাদু বললেন, ‘এই দেখো। গীত শব্দের শুরুতে আছে কণ্ঠ্য ধ্বনি গ। তাই সংগীত শব্দে কণ্ঠ্য-নাসিক্য ধ্বনিঙ/ং হয়েছে। জয় শব্দের শুরুতে আছে তালব্য ধ্বনি জ। তাই সঞ্জয় শব্দে তালব্য-নাসিক্য ধ্বনি ঞ হয়েছে। দেশ শব্দের শুরুতে আছে দন্ত্য ধ্বনি দ। তাই সন্দেশ শব্দে দন্ত্য-নাসিক্য ধ্বনি ন হয়েছে। আর ভার শব্দের শুরুতে আছে ওষ্ঠ্য ধ্বনি ভ। তাই সম্ভার শব্দে ওষ্ঠ্য-নাসিক্য ধ্বনি ম-এর কোনো বদল ঘটেনি।’

নেহা বলল, ‘এখানে পরের ধ্বনির প্রভাবে আগের ধ্বনি বদলে যাচ্ছে। তাই না, দাদু?’

‘ঠিক তাই! পরের ধ্বনির প্রভাবে আগের ধ্বনি বদলে যাচ্ছে। ...এগুলো যেহেতু বুঝেছ, আরও কয়েকটা উদাহরণ লিখে দেই।’ এই বলে ভাষা-দাদু কাগজে লিখলেন:

সম্ + কল্প = সংকল্প
সম্ + চয় = সঞ্চয়
সম্ + দেহ = সন্দেহ
সম্ + বোধন = সম্বোধন

তারপর কাগজটা দুজনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ‘এটা নিয়ে যাও। এরপর বাসায় গিয়ে নিজে নিজে বোঝার চেষ্টা করো।’ ■

লেখক: শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মজার ঋতু শীত

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। এই ছয়টি ঋতুই ছয় রকমের ভিন্ন ভিন্ন আভাস নিয়ে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটায়। পৃথিবীতে একমাত্র বাংলাদেশেই এই ঋতু বৈচিত্র্যের দেখা মিলে। বাংলা বারো মাসের দুইটি করে মাস নিয়ে একটি ঋতু। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্মকাল, আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল, ভাদ্র-আশ্বিন শরৎকাল, কার্তিক-অগ্রহায়ণ হেমন্তকাল, ‘পৌষ-মাঘ শীতকাল, ফাল্গুন-চৈত্র বসন্তকাল। ছয় ঋতুর পঞ্চম ঋতু হচ্ছে শীত ঋতু।

এক রোমাঞ্চকর ঋতুর নাম শীত ঋতু। শীতকাল আমাদের দেশের একটি মজার ঋতু। বাংলাদেশে শীতকাল স্থায়ী হয় মাত্র দুইমাস। এ সময় নানারকম পিঠা বানানো, বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাওয়া, শীতের নানা রঙের সবজি, নানা ফল, শীতের পোশাক, অতিথি পাখির আগমন এ সব কিছুই আমাদের আনন্দ দেয়। শীতের সকালে আয়েশ করে রোদ পোহানো, রোদে বসে নানারকম পিঠা খাওয়া, খেজুরের রস, পুকুরে মাছ ধরা, কুয়াশা মাখা সবুজ প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানোর মজাই আলাদা।

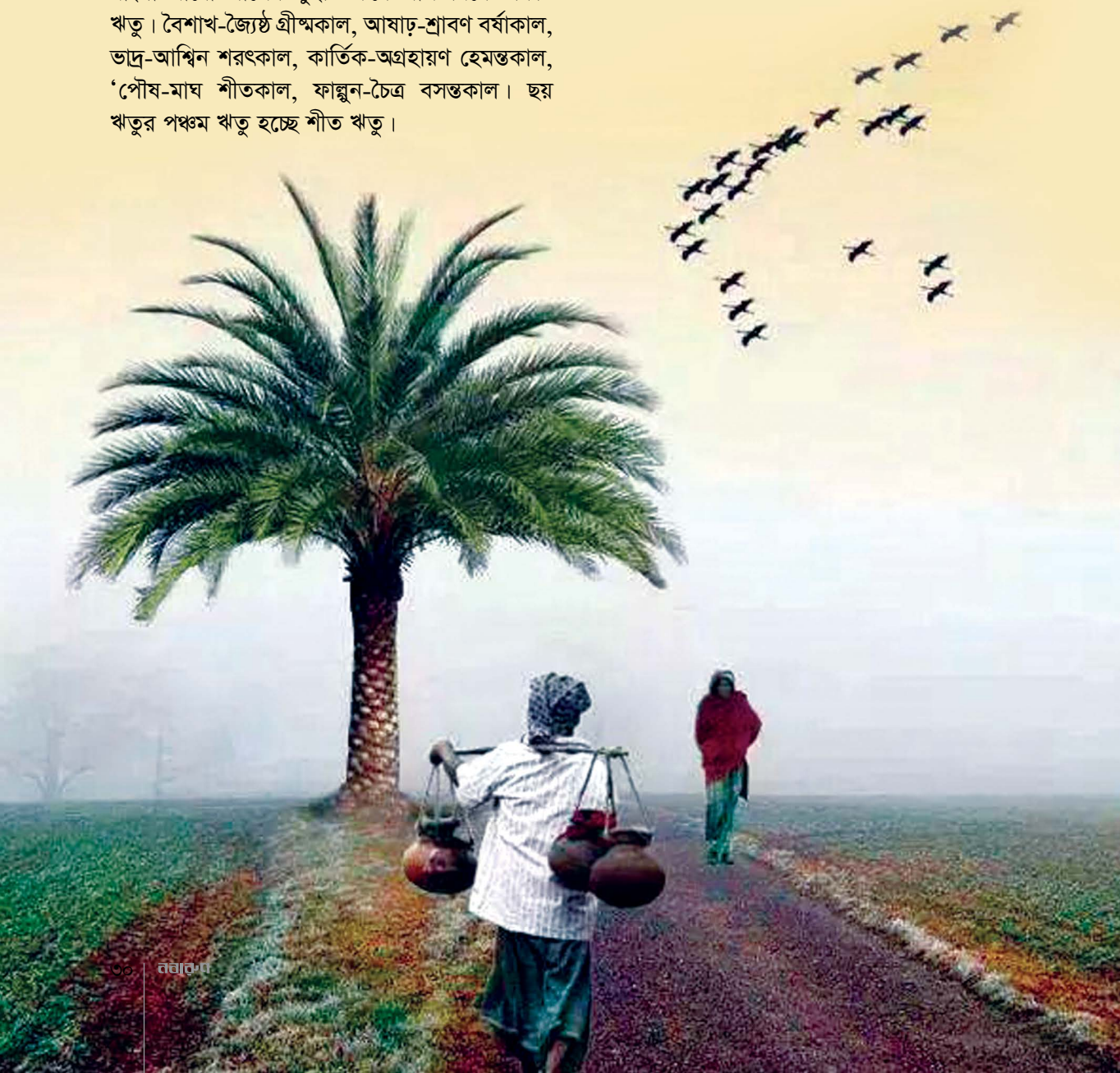

শীত মানেই নতুন নতুন পিঠার স্বাদ নেওয়া। তাই শীত এলেই ঘরে ঘরে নতুন ধানের চাল আর খেজুরের গুড়ের পিঠা পায়েস বানানোর ধুম পড়ে যায়। ভাপা, পুলি, সেমাই পিঠা, দুধ চিতই, পাটিসাপটা, পাকন পিঠা, বিবিখানা পিঠা, ম্যারা পিঠা, এগুলো আমাদের দেশের উল্লেখযোগ্য পিঠা।

শীতের আগমন প্রকৃতিকে জানান দিয়ে আসে ভিন্নভাবে। কুয়াশার সাদা চাদর, শিশির ভেজা সবুজ ঘাস ও কনকনে শীতল হাওয়াই বলে দেয় শীত আসছে। শীতঋতু একটি মজার ঋতু। বাংলাদেশে শীতকাল স্থায়ী হয় মাত্র দুই মাস। পৌষ-মাঘ শীতকাল হলেও অগ্রহায়ণ মাস থেকেই শীতের সূচনা হতে থাকে। শীতকালের আবহাওয়া থাকে শুষ্ক, এছাড়া বৃষ্টিবাদলও হয় না। তাই চলাফেরায় বেশ মজা পাওয়া যায়। গ্রাম বা শহর সব জায়গায়ই শীতের একটা মজার আমেজ থাকে। শীতের রাত্রিটা বড়ো হওয়ায় কর্মব্যস্ত মানুষ ঘরে ফিরে যথাসম্ভব ল্যাপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে আরামে ঘুম দেয়।

এ সময় গাছে গাছে ফুটে নানা বাহারি ফুল। যেমন– গাঁদা, ডালিয়া, সূর্যমুখী, গোলাপ প্রভৃতি ফুল শোভাবর্ধন করে থাকে। ফুলের দোকানগুলোতে বাহারি ফুলে ভরে যায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অতিথি বরণ করতে ফুলের দোকানগুলোতে নানারকম ফুলের ডালি তোড়া বা মালাসহ সুসজ্জিত ফুলের উপকরণ বিক্রির হিড়িক পড়ে যায়। শীতে নানা রঙের সবজির পাশাপাশি খেজুর গাছের মিষ্টি রস, নানারকম পিঠাসহ হরেক রকমের সুস্বাদু খাবার পাওয়া যায়। সরিষা ফুলের হলুদ ক্ষেত আর মৌমাছির গুঞ্জনের দৃশ্যও মনকে পুলকিত করে।

শীতের সকাল গ্রামের সাধারণ মানুষদের কাছে কনকনে ঠাণ্ডা আর ঘন কুয়াশা যেন নৈমিত্তিক ব্যাপার। মাঝে মাঝে শৈত্যপ্রবাহ হয়। কনকনে ঠান্ডায় একটু উত্তাপ পেতে গ্রামে শিশু, কিশোর যুবক, বৃদ্ধরা আগুনের কুণ্ডলি তৈরি করে উত্তাপ নিতে দেখা যায়। কোনো কোনো এলাকায় ঘন কুয়াশার সঙ্গে ঝিরিঝিরি শিশির বিন্দুর অপরুপ দৃশ্য চোখে পড়ে। কুয়াশা ভেদ করে সুয্যিমামা উঁকি দিয়ে প্রকৃতি রাঙিয়ে তোলে সোনালি রোদ।

শীতের আগে আগেই কৃষকরা নতুন ধানের চাল করে রাখে ঘরে। শীতের শুরুতেই নতুন চালের পিঠা পায়েস বানানোর ধুম পড়ে যায়। এটাই হলো শীতকালীন এক উল্লেখযোগ্য বাংলার ঐতিহ্য। শীতে গ্রামে, শহরে সবখানেই চলে নবান্ন উৎসব। আমাদের দেশে ১৫০ বা তারও বেশি রকমের পিঠা রয়েছে। তবে অঞ্চলভেদে রয়েছে নানারকম পিঠা। শীতে দেশের নানা স্থানে গ্রাম ও শহরের সবজায়গায়ই পিঠা উৎসব এবং পিঠা মেলার আয়োজন করা হয়।

শীতে খেজুরের কাচা রস রোদে বসে খাওয়ার মধ্যে একটা আলাদা স্বাদ আছে। আর সুন্দর পরিবেশের মধ্যে খেজুর রসের পায়েস আর নলেন গুড়ের কথা ভাবলেই যেন মনে হয় এমন বাংলায় সারা বছরই শীত থাকুক।

এছাড়া এ সময় সুদূর সাইবেরিয়া থেকে অতিথি পাখি বাংলাদেশে এসে মাঠে-ঘাটে ও বিলেঝিলে এ গাছ থেকে সে গাছে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। যা আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। এই অতিথি পাখি দেখতে অসংখ্য মানুষ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরতে যায়।

ভ্রমণের জন্য তো শীতকালের বিকল্প নেই। এ সময় রাস্তাঘাট শুকনো থাকে, আকাশ থাকে ঝকঝকে, ঝড় বাদলের ভয় না থাকায় সবাই ভ্রমণের জন্য এ সময়টাকেই বেছে নেয়। কক্সবাজার, টেকনাফ, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, সিলেট, সুন্দরবনসহ দেশের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে প্রচুর লোকের সমাগম হয় যা অন্য কোনো ঋতুতে হয় না।

পৌষসংক্রান্তি বা মকরক্রান্তি বাঙালি সংস্কৃতিতে একটি বিশেষ উৎসবের দিন। এটিও শীত উৎসবেরই একটি অংশ। পৌষ মাসের শেষের দিন এই উৎসব পালন করা হয়। এদিন বাঙালিরা বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তার মধ্যে পিঠা খাওয়া, ঘুড়ি উড়ানো অন্যতম। সারাদিন ঘুড়ি উড়ানোর পরে সন্ধ্যায় পটকা ফুটিয়ে, ফানুস উড়িয়ে উৎসবের সমাপ্তি হয়। মোটকথা সুবিধা অসুবিধা দুয়ে মিলে শীত আমাদের জীবনে প্রতি বছর দুই মাস অন্যরকম ভালো লাগার অনুভূতিতে হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে তোলে। ■

পৃথিবী বদলে দেওয়া বিজ্ঞানী

অনিক শুভ

আমাদের এই বিশ্বে কোটি কোটি মানুষ বাস করলেও মাত্র গুটি কয়েক মানুষ বদলে দিয়েছেন মানব সভ্যতার গল্প। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, নিউটন, গ্যালিলিও, জেমস কুক, আইনস্টাইনসহ হাজারো মহামানবদের চেষ্টা, চিন্তা এবং পরিশ্রমের ফল আমাদের আধুনিক পৃথিবী এবং সমাজ। তবে এদের কাতারে আরেক মহামানবের নাম না বললেই নয়, তিনি হলেন বিখ্যাত উদ্ভাবক নিকোলা টেসলা। তাকে বলা হয় আধুনিক সময়ের 'দ্য ভিঞ্চি'। তিনি একাধারে বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, পদার্থবিদ এবং ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

বলা হয়ে থাকে এই মহান বিজ্ঞানীর জন্ম হয় প্রচণ্ড ঝড় ও বজ্রপাতের রাতে। এ রকম ঘটনাকে অশুভ সংকেত মনে করে সেই সময়ে ধাত্রী টেসলাকে 'অন্ধকারের সন্তান' বলেন। কিন্তু এতে টেসলার মা অপমানিত বোধ করে এর বিরোধিতা করে বলেন, টেসলা হবে 'আলোর সন্তান'; টেসলার মায়ের সেই ভবিষ্যৎ বাণী যে কতটা কার্যকর ছিল তা নিশ্চয়ই আর বলার অপেক্ষা রাখে না ! ১৮৫৬ সালের ১লা জুলাই ক্রোয়েশিয়ার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম্য অঞ্চলে নিকোলা টেসলা জন্মগ্রহণ করেন। গবেষণার জন্য বিয়ে করেননি তিনি। তাঁর ছিল অদ্ভুত কিছু সমস্যা। যেমন– ইনসমনিয়া, শুচিবাই ও অত্যধিক গোছানো। শোনা যায়, এক সপ্তাহে টানা ৮৪ ঘণ্টা না ঘুমিয়ে কাজ করেছেন। এছাড়া দিনে মাত্র ৩ ঘণ্টা ঘুমাতেন। তিনি মূলত দিক পরিবর্তী বা পর্যায়ক্রমিক বিদ্যুৎ প্রবাহে অবদান রাখার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আমাদের ঘরের টিভি থেকে শুরু করে খেলনা গাড়ি, ড্রোনসহ বিভিন্ন কাজে রিমোট কন্ট্রোল আমাদের ঘরের আসবাবে অংশ এখন।

বর্তমানে আমাদের জীবনে ইন্টারনেট আর ওয়াই-ফাই এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের মধ্যে একটি। এই ওয়াই-ফাই প্রযুক্তির ধারণাও দেন সর্বপ্রথম নিকোলা টেসলা। তাঁর মৃত্যুর অনেক বছর পর টেসলার গবেষণার উপর ভিত্তি করে ওয়াই-ফাই তৈরি করা

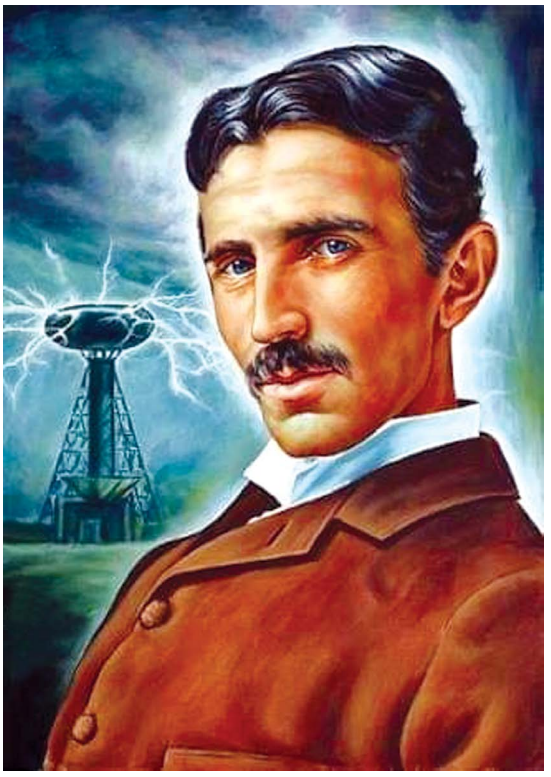

হয়। নিকোলা টেসলার এই অবদানের জন্য সিলিকন ভ্যালিতে তাঁর একটি মূর্তি তৈরি করা হয়েছে যেখান থেকে ফ্রি ওয়াই-ফাই সুবিধা দেওয়া হয়।

শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক সম্পদের দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়া নিয়ে বেশ সোচ্চার ছিলেন তিনি এবং পুনরায় ব্যবহারযোগ্য জ্বালানির সমর্থক ছিলেন। তাছাড়া তিনি কীভাবে প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহার করে জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর থেকে চাপ কমানো যায় সেই বিষয়েও বহু গবেষণা করেছেন। এমনকি তাঁর জিনের ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম বীজ তৈরি করার মতো সফল গবেষণা রয়েছে।

১৯৪৩ সালের ৭ই জানুয়ারি এই সেরা বিজ্ঞানী চলে যান না ফেরার দেশে। তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন সুন্দর ভবিষ্যৎ। তাকে সম্মান জানাতে বানানো হয়েছে বহু গল্পের সিনেমা। এই সময়ের সেরা উদ্যোক্তা এলন মাস্ক তাঁর নামানুসারে ইলেকট্রিক গাড়ি কোম্পানির নাম দেন 'টেসলা মোটরস'! ■

লেখক: প্রাবন্ধিক

কবিতাগুচ্ছ

শীতের ছড়া

নীহার মোশারফ

হিমেল হাওয়া
পৌষে মাঘে
গাছের থেকে
পাতা ঝরে
বরই ঝরে
ছোট্ট খুকুর
কথা ঝরে
সন্ধ্যে হলে
গল্প দাদুর
আসর বসে;
খুব সকালে
ঘাসের ওপর
শিশির দানা হাসে–
আগুন শেষে
বাংলাদেশে
শীতের ঋতু আসে।

ছয় ঋতুর বাংলাদেশ

খাইরুল ইসলাম ভূইয়া (শান্ত)

ছয় ঋতুর এই বাংলাদেশে প্রকৃতির কত খেলা,
গ্রীষ্ম আমার প্রথম ঋতু আনন্দেরই মেলা।
গ্রীষ্মের পরে বর্ষা আসে ভরপুর নদীর পানি,
প্রকৃতির আজ বুক জুড়ালো শান্ত মরুভূমি।
বর্ষার পরে শরৎ আসে শিউলি ফুলের গন্ধ,
প্রকৃতিতে উড়ে বেড়ায় কাশফুলের ছন্দ।
শরতের পর হেমন্ত আসে উঠে নবান্নের ধান,
সরষে ফুলের গন্ধে তখন প্রকৃতি অম্লান।
হেমন্তের পর শীত আসে পিঠাপুলির দিন,
তীব্র শীতে প্রকৃতির সব বিবর্ণ মসৃণ।
শীত শেষে বসন্ত আসে নতুন কুঁড়ি ফুটে,
ফুলে ফুলে মৌমাছি গুঞ্জন রূপ বৈচিত্র্যের সাজে।
আমার দেশের ছয়টি ঋতু ভিন্ন ভিন্ন রূপ,
মা জননী এই রূপে পায় যেন তার সুখ।

সবুজ পাতার রঙে

শাহ্ সোহাগ ফকির

রাত পোহালে সূর্যে রঙিন দিন,
পাতার কাছে তাই তো আমার ঋণ।
পিঠ পুড়ানো ঝলসানো ঐ রোদ,
পাতা আমায় দেয় যে প্রতিরোধ।
সবুজ হলুদ লাল পাতাদের ঝাঁক,
সারাবেলা তাই আমার সাথে থাক।
বটের পাতা এমন শীতল ছায়া,
ঠিক যেন ঐ আমার মায়ের মায়া।
নিম পাতাদের মিষ্টি হাওয়ার রেশ,
কী যে দারুণ আমার লাগে বেশ।
আমার যত কথা মনে জাগে,
পাতার সাথে বলি অনুরাগে।
সবুজ পাতার রঙে আঁকতে মন,
পাতার মতো সজীব হওয়ার পণ।

মোরগ ডাকে

ইমরান খান রাজ

মোরগ ডাকে কক কক
স্যার করে বক বক
ট্রেন চলে ঝক ঝক
তেঁতুল ফল টক টক!

ঘোড়া চলে টগ বগ
পানি খায় ঢক ঢক
হিরা মানিক চক চক
খোকার হাসি ফক ফক!

সাইকেল

আহসান হাবীব

টিপুল ঠিক করেছে নতুন বছরে সে ভালো হয়ে থাকবে। কোনোরকম দুষ্টুমি করবে না। ছোটো বোন অন্তরার পিছনে লাগবে না অর্থাৎ ওকে ঘাটাবে না। তার মাটির ব্যাংক থেকে কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পয়সা চুরি করবে না। নিয়মিত পড়ালেখা করে ভালো রেজাল্ট করবে। বাবা-মাকে একদম খুশি করে দিবে। বিষয়টা সে মাকে অফিসিয়ালি জানালো। মা রান্না করছিলেন। ঠান্ডা মুখে সব শুনলেন তারপর বললেন-

- খুব ভালো। আর কিছু বললেন না। টিপুলের মনে হলো তার কথা মা বিশ্বাস করলেন না। তারপরও সে আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল; মা যদি কিছু বলেন। মানে মা যদি বলেন 'ঠিক আছে তুমি তোমার কথা রাখতে পারলে তোমাকে একটা সাইকেল বা আইফোন বা কোনো ভিডিও গেম কিনে দেওয়া হবে।' নাহ সেরকম কিছু বললেন না মা। ডালে বাগার দিতেই থাকলেন... দিতেই থাকলেন।

টিপুল এবার গেল অন্তরার কাছে। তাকে বলল মাকে যা বলেছে। অন্তরা একটা গল্পের বই পড়ছিল। বই বন্ধ করে সব শুনল, তারপর মুখ বাঁকিয়ে ফের বই পড়তে লাগল।

শেষ পর্যন্ত গেল বাবার কাছে

- বাবা?

- বলো

- ২০২১ সালে... মানে নতুন বছরে আমি কটা পরিকল্পনা করেছি।

- কী পরিকল্পনা?

টিপুল গরগর করে বলে গেল তার পরিকল্পনার কথা, যেমনটা বলেছিল

মাকে এবং অন্তরাকে। বাবা পেপার পড়ছিলেন। পেপার পড়া বন্ধ করে সবটা শুনলেন। তারপর মাথা ঝাঁকালেন।

- ভেরি গুড। যদি তোমার কথা তুমি রাখতে পারো তাহলে আমি তোমাকে একটা সাইকেল কিনে দিব। আর যদি কথা রাখতে না পারো। রেজাল্ট খারাপ হতেই থাকে আগের মতো ...তাহলে...
- তাহলে? টিপুল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় বাবার দিকে।
- তাহলে বিশটা সাইকেল কিনে দিব।
- মানে? টিপুলের মুখ হা হয়ে গেল।
- বুঝলে না। তোমার রেজাল্ট যদি খারাপ হতেই থাকে তাহলে তুমি ভালো কোনো চাকরিবাকরি পাবে না। তখন কিছু করে খেতে হবে না তোমাকে? তখন ঐ সাইকেল বেচাকেনা করে খাবে। এই জন্য বিশটা সাইকেল। বাবা মুচকি হেসে পেপার পড়ায় মনোযোগ দিলেন।

আর কী আশ্চর্য হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষায় টিপুল সবাইকে চমকে দিয়ে সেকেন্ড হয়ে গেল। বাবা-মা তো চমকালেন, অন্তরা বেশি চমকালো। তবে বাবা তার কথা রাখলেন সাত হাজার টাকা দিয়ে টিপুলকে একটা সাইকেল কিনে দিলেন। টিপুল এখন সাইকেলে করে স্কুলে যায়। মাঝে মাঝে বিকেলে ঘুরতে যায়। বেশ লাগে তার। কিন্তু একদিন সাইকেলটা রেখে দোকানে গেল কী একটা কিনতে। ফিরে এসে দেখে সাইকেল নেই। চুরি হয়ে গেছে। সে আশপাশে অনেককে জিজ্ঞেস করল। একজন বলল সে দেখেছে মাথায় টাক, গোঁফ আছে শুকনো মতো একটা লোক সাইকেলটা নিয়ে যাচ্ছে। সে মনে করেছে ওরই সাইকেল তাই নিয়ে যাচ্ছে।

ভীষণ মন খারাপ করে বাসায় ফিরল টিপুল। বাবা অবশ্য বললেন–

- ঠিক আছে ফাইনালে আবার কেনা যাবে। মন খারাপ করো না।

বেশ কদিন চলে গেল। সাইকেলের জন্য মন খারাপটা আর অতটা নেই। তার যে একটা সাইকেল ছিল এই ব্যাপারটাও আর মনে হয় না। যেন তার কোনো সাইকেলই ছিল না কোনোদিন।

একদিন স্কুলে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখে তার সাইকেলটা চালাচ্ছে একটা মেয়ে। অন্তরার বয়েসি হবে। মেয়েটার চুল উড়ছে বাতাসে। মেয়েটার মুখটা হাসি হাসি। হয়ত সাইকেল চালানোর আনন্দে। এদিক ওদিক তাকালো টিপুল; দেখে ফুটপাতে বসে একটা লোক মাথায় টাক, গোঁফ আছে, কালো মতো। লোকটা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল-

- মলি মা বেশি দূর যেও না।

তার মানে এই লোকটা তার সাইকেল চুরি করেছিল তার মেয়ের জন্য। টিপুলের আর সহ্য হলো না। সে লোকটার কাছে গিয়ে বলল–

- আংকেল?
- কিছু বলবে?
- হ্যাঁ।
- বলো।
- ঐ যে সাইকেল চালাচ্ছে ওটা আপনার মেয়ে?
- হ্যাঁ আমার একটাই মেয়ে, মলি।
- ও যে সাইকেলটা চালাচ্ছে ওটা আমার। কদিন আগে চুরি হয়েছে। টিপুল খেয়াল করল মুহূর্তেই লোকটার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একটু চুপ থাকল। তারপর বলল–

- আসলে আমার মেয়েটার খুব শখ সাইকেলের। কিন্তু আমার চাকরি চলে গেছে। আয় রোজগার নেই। সাইকেল কেনার ক্ষমতা নেই। তাই হঠাৎ ভুল করে ফেলেছি... তুমি এখনি সাইকেলটা নিবে?

এই সময় মেয়েটা এসে সাইকেল ব্রেক করে থামল। মেয়েটা ঘামছে। মুখটা খুশি খুশি। মেয়েটা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল-

- ও কে বাবা?

- আমি টিপুল। আচ্ছা যাই স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে। 'তোমার বাবাকে বলছিলাম তোমার সাইকেলটা সুন্দর...' মেয়েটা টিপুলের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল।

স্কুলের দিকে হাঁটা দিল টিপুল। মনে মনে ভাবল, বাবারা কখনো চোর হতে পারে না। এই সাইকেলটা হয়ত তার সাইকেলের মতো আরেকটা সাইকেল। মেয়েটার বাবা তাকে কিনে দিয়েছে। ■

লেখক: কার্টুনিস্ট ও গল্পকার

নতুন বইয়ের ঘ্রাণ

আব্দুস সালাম

ভবানীপুর প্রাইমারি স্কুলের অবস্থানটা এমন এক জায়গায় যে আশপাশের কয়েকটি গ্রামের ছেলেমেয়েরা ওই স্কুলে পড়ালেখা করে। স্কুলে কেউ আসে মেঠো পথ ধরে আবার কেউ আসে সাঁকো পার হয়ে। স্কুল ছুটির পর ঠিক একইভাবে তাদেরকে আপন আপন বাড়িতে ফিরে যেতে হয়। স্কুলের পরিবেশটা বেশ ভালো। চারিদিকে সবুজ গাছপালা। জীবন ও জীবিকার তাগিদে সবাই ব্যস্ত। পড়ালেখা করার প্রতি তাদের কোনো মনোযোগ নেই। পড়ালেখার গুরুত্ব অনেকেই বোঝে না।

ভবানীপুর গ্রামের ছেলে রাশিদুল ইসলাম ঢাকাতে চাকরি করে। গ্রামের লোকজন, মাঠঘাট, নদীনালা সবকিছুই তার ভালো লাগে। তাই ছুটি পেলেই সে গ্রামে ছুটে আসে। ইংরেজি নববর্ষের প্রথম কয়েকটি দিন গ্রামে থাকার জন্য রাশেদুল গ্রামে এসেছে। সকালবেলায় ভাপাপিঠা ও কয়েকটি ভাপাপুলি খেয়ে উজ্জ্বল নামে এক বন্ধুর সাথে সে ঘুরতে বের হয়েছে। মাঠে মাঠে সরষে ফুলের ক্ষেত। পথের ধারে কয়েকটি খেজুরগাছে রসের ভাঁড় ঝুলছে। শিশিরভেজা ঘাস মাড়িয়ে তারা ভৈরব নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নদীর পাড়ে তারা ঘোরাফেরা করছে। কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করার পর প্রাইমারি স্কুলের রাস্তা ধরে বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকে। রাশেদুলকে দেখে দৌড়ে একটি মেয়ে সামনে এসে সালাম দিয়ে বলে ভাইয়া কেমন আছেন?

আয়ান হক ভূঁঞা, জুনিয়র ওয়ান, স্টার হাতেখড়ি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা

আমি ফুলকি। চিনতে পেরেছেন? মুহূর্তের মধ্যে রাশেদুলের মনে চার বছর আগের স্মৃতির কথা মনে পড়ে যায়। তারপর সে উত্তর দেয় 'ও ... ফুলকি? কামাল চাচার মেয়ে?'

: জী।

: তুমি কোন ক্লাসে পড়?

: এবার চতুর্থ শ্রেণিতে উঠলাম।

: বাহ! খুব ভালো কথা। পড়াশোনা করতে কোনো সমস্যা হয় না তো?

: না। কোনো সমস্যা হয় না। আমি নিয়মিত স্কুলে যাই। পড়ালেখায় ফাঁকি দেই না। বাবা-মাকেও সব কাজে সাহায্য করি। আমি ভালোভাবে পাস করেই উপরের ক্লাসে উঠেছি। আমার পড়াশুনা করা দেখে বাবাও এখন খুশি। বাবা বলেন, তোকে অনেক দূর পর্যন্ত পড়াব...।

ফুলকির সাথে কুশলাদি বিনিময়ের পর দুই বন্ধু আবার হাঁটা শুরু করল। উজ্জ্বল রাশেদুলকে জিজ্ঞাসা করল মেয়েটি কে? রাশেদুল চার বছর আগের স্মৃতি থেকে বলতে শুরু করল। চার বছর আগে বছরের প্রথম দিকে এভাবেই হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম। বিভিন্ন শ্রেণির ছেলেমেয়েরা নতুন বই হাতে নিয়ে আনন্দ করতে করতে স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরছিল। সকলের মুখে হাসি। নতুন বইয়ের ঘ্রাণে তারা মাতোয়ারা। সরষে ক্ষেতের আইল দিয়ে কেউ কেউ হেঁটে যাচ্ছিল। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলাম একটি গাছতলাতে কয়েকজন বালক গোল হয়ে বসে নতুন বাংলা বইয়ের গল্প পড়ছে। কেউ আবার মনের আনন্দে ছড়া পড়ছে। ঠিক সেসময় অল্প বয়সের এক মেয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাদের গল্প ছড়া শুনছিল। তার হাতে ছিল একটি ঝাঁটা ও একটি বস্তা। আমাকে দেখে বালকগুলো চলে গেল। দাঁড়িয়ে থাকল সেই মেয়েটি। আমি লক্ষ করলাম মেয়েটি গায়ের জামা দিয়ে চোখের জল মুছছে। মেয়েটির সাথে কথা বলে জানতে পারলাম তার নাম ফুলকি আর বাবার নাম কামাল। রশিকপুর গ্রামেই তাদের বাড়ি। তার বাবা মাঠে কাজ করে। সে মা-বাবার সংসারে সাহায্য করে। প্রতিদিন বাগানে বাগানে ঘুরে শুকনা পাতা ও জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে। শুকনা পাতা ও জ্বালানি কাঠ দিয়ে তার মা রান্না করে। আমি তার সাথে কথা বলে আরও জানতে পারলাম যে, ফুলকির পড়ালেখা করার খুব শখ। তার খুব ইচ্ছা স্কুলে ভর্তি হয়ে বন্ধু-বান্ধবের সাথে স্কুলে যাবে। কিন্তু তার বাবা তাকে স্কুলে ভর্তি করায় না। স্কুলে ভর্তি হতে চাইলে তার বাবা বলে মেয়েদের পড়ালেখা করার দরকার নেই।

ফুলকিকে স্কুলে ভর্তি না করার কারণ জানতে সেদিন আমি ফুলকির বাবার সাথে দেখা করেছিলাম। ফুলকির বাবা আমাকে বলেছিল: আমরা গরিব মানুষ। কোনোরকমে বেঁচে আছি। মেয়েকে পড়ালেখা করার সামর্থ্য আমার নেই। তাই ভাবছি ফুলকি একটু বড়ো হলেই বিয়ে দিয়ে দেবো। মেয়েদের এত পড়াশোনা করার কী দরকার? তারা তো আর চাকরিবাকরি করবে না। পরের ঘরে গেলে তো রান্না করেই খেতে হবে।...

আমি সেদিন ফুলকির বাবাকে বুঝিয়ে ছিলাম নারীশিক্ষার গুরুত্ব কতখানি। ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা করানোর জন্য তেমন কিছুই করতে হয় না। সরকারি খরচে পড়ালেখা করার সুযোগ রয়েছে। প্রতিবছর বিনামূল্যে পাঠ্যবই পাওয়া যায়। উপর ক্লাসে মেয়েদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। পরীক্ষার ফি এবং খাতা-কলম বাবদ সামান্য কিছু টাকা-পয়সা খরচ হয়। আর দেরি না করে আগামীকালই ফুলকিকে স্কুলে ভর্তি করে দেন।

সেদিন আমার কথা শুনে ফুলকির বাবা ফুলকিকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। এরপর থেকে তাদের সাথে আমার আর দেখা হয়নি।অনেকদিন পর আজ ফুলকির সাথে দেখা হয়ে গেল। সে পড়াশুনা করে জেনে খুব ভালো লাগল। উজ্জ্বল রাশেদুলের পিঠ চাপড়ে বলল : ঠিকই বন্ধু নতুন বইয়ের ঘ্রাণ বড়োই মধুর। এই ঘ্রাণ ফুলকির মতো হাজারও শিশুর জীবনকে খুব সহজেই পালটে দিতে পারে। ■

লেখক: গল্পকার ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা

গল্প

সময়ের অতিথি

নজরুল হাসান ছোটন

একই গ্রামের দুই ছেলে সজল ও সৌরভ। তারা একই ক্লাসে পড়ে। তাদের মধ্যে সজল ছিল দুষ্ট ও চঞ্চল। আর সৌরভ ছিল শান্ত। সজলের বাবা একজন কৃষক আর সৌরভের বাবা চাকুরিজীবী।

সজল দুষ্ট আর সৌরভ শান্ত হলেও দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব ভালোই ছিল। তারা একত্রে স্কুলে যেত। আবার একত্রে স্কুল থেকে ফিরত।

সজল স্কুলে যাওয়া আসার সময় পথে পাখি দেখলে ঢিল ছুড়ত। সৌরভ বাধা দিত। কিন্তু সজল শুনত না। সে প্রায়ই গুলাইল দিয়ে পাখি মারত। ফাঁদ পেতে পাখি আটকাত। সৌরভের এসব ভালো লাগত না। তাই তার চোখে পড়লেই সে সজলকে এসব কাজ করতে না করত।

একদিন সৌরভ দেখল সজল গুলাইল দিয়ে পাখি মারছে। সাথে সাথে সে সজলের কাছ থেকে গুলাইলটি ছিনিয়ে নিল এবং বলল, তোকে না কতবার বলেছি পাখি মারিস না।

সজল এতে রাগ হয়ে যায়। বলে, আমি পাখি মারলে তোর কী?

সৌরভ বলল, পাখিদের মারা অন্যায়। এরা আমাদের উপকার করে।

সজল সৌরভের কথা মানে না। বলে, থাক আমারে আর বলতে হইব না। আমি কি সব পাখি মারি? যেই সব পাখির গায়ে মাংস বেশি থাকে, বিদেশ থাইক্যা আসে। অদের মারি। ওদের মারাও নিষেধ।

কিন্তু দুষ্ট সজল সৌরভের এ কথাও মানে না। রাগের স্বরে বলে, যা যা, আমারে উপদেশ দিতে হইব না। এই সব বিদেশি পাখিরা আমাদের দেশে নদীনালা, খালবিলের অনেক মাছ খাইয়া ফালায়। সে জন্যই আমাদের দেশের মাছের সংখ্যা কইম্যা যাইতাছে।

সৌরভ তখন সজলের ভুল ভাঙানোর জন্য বলে, এটা তোর ভুল ধারণা।

এসব বিদেশি পাখিরা আর ক'টা মাছ খায়? মাছ কমে যাচ্ছে কিছু লোভী ও কপট লোকের কারণে। তারা যে-সব মাছ বড়ো না হলে ধরা নিষেধ। সেগুলো ছোটো

থাকতেই ধরে ফেলছে। ডিমওয়ালা মাছগুলো ধরে ফেলছে। তাই মাছের আর বংশবৃদ্ধি ঘটতে পারছে না। মাছের সংখ্যা কমেই যাচ্ছে।

সজল এবার কিছুটা দুঃখ মনেই সৌরভকে বলে, তুই তো বড়োলোকের ছেলে! তোর কী? আমরা বড়োলোক না! আমি পাখি মাইরা নিলে মা খুশি মনে রান্না কইরা দেয়।

তোর মা অতিথি পাখি মারা নিষেধ, তা জানে না বলেই তোকে কিছু বলে না।

সজল এবার জানতে চায়, পাখিরা আমাদের এমন কী উপকার করে?

সৌরভ তখন বলে, মিনহাজ স্যার গত সোমবার ক্লাসে বলেছিল যে, পাখিরা আমাদের অনেক উপকার করে। ওরা পোকামাকড়, শামুক-ঝিনুক, কাঁকড়া খেয়ে অনেক কমিয়ে দেয়। তাতে উপকার হয়। তুই তো সোমবার স্কুলে যাসনি। তাই শুনতে পাসনি।

সজল এবার স্বীকার করে। ঠিক আছে, স্যার যদি বলে তাইলে আমি মাইন্যা নিমু।

কিন্তু তারপরও একটি প্রশ্ন তার মাথায় ঘোরপাক খায়। সে সৌরভকে বলে, কত কিছুই তো বললি। এই পাখিদের কি আমরা আমাদের দেশে দাওয়াত কইরা আনি? তবে অরা অতিথি হইল কী কইরা?

সৌরভ এর উত্তর জানে না। তাই বলল, এখন বাড়ি চল। কালকে তোকে স্যারকে বলে বুঝিয়ে দিব ওদের আমরা অতিথি পাখি বলি কেন।

পরদিন সজল ও সৌরভ একত্রে স্কুলে যায়। ক্লাস শুরু হলে মিনহাজ স্যার রুমে ঢুকে। স্যার ক্লাসে ঢুকেই দেখেন, সৌরভ তার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন কিছু বলতে চাচ্ছে।

স্যার সৌরভের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাচ্ছ?
জী স্যার।
বলো।

স্যার আপনি না বলেছিলেন অতিথি পাখি মারা নিষেধ। ওরা আমাদের উপকার করে।

হ্যাঁ বলেছিলাম তো।

কিন্তু সজল এটা বিশ্বাস করে না। ও অনেক অতিথি পাখি মারে!

স্যার সজলের দিকে তাকিয়ে বলে, বলো কী! অতিথি পাখি তো মারা নিষেধ! সরকার থেকে নিষেধ করা হয়েছে। অতিথি পাখি মারলে তার জন্য আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সজল তখন বলে, কিন্তু কেন স্যার?

এই অতিথি পাখিরা আমাদের অনেক উপকার করে। আমাদের দেশে নদীনালা, খালবিল, হাওর-বাঁওড় অনেক বেশি। এসব এলাকায় অনেক শামুক-ঝিনুক-কাঁকড়া এবং নানা রকম পোকামাকড় থাকে। অতিথি পাখিরা এগুলো খেয়ে এদের বংশ বৃদ্ধি কমিয়ে দেয়।

সজলের মনে তখন প্রশ্ন জাগে, পোকামাকড় বেশি হলে কী হয়। সে স্যারকে বলে, পোকামাকড় বেশি হইলে কী হইত স্যার?

স্যার সজলকে কথাটি বোঝানোর জন্য উলটো প্রশ্ন করে, তোমাকে কি রাতে মশা কামড়ায়? দিনে মাছি জ্বালাতন করে?

জী স্যার। রাত্রে মশার জন্য ঠিকমত বইস্যা পড়তে পারি না। শুধু কামুড় দেয়। দিনে মাছির জন্য খাবার-দাবার সবসময় ঢাইক্যা রাখতে হয়। খোলা খাবার পাইলেই অরা সেখানে বসে।

স্যার এবার বলে, তাহলে বোঝ। এই দুই রকম পোকার জ্বালাতন-ই আমরা সহ্য করতে পারছি না। আমাদের দেশে হাজার রকম পোকা আছে। এইসব পোকাদের বংশ বৃদ্ধি ঘটলে এরাও আমাদের আক্রমণ করত। আবার শামুক-ঝিনুক-কাঁকড়ার বংশ বৃদ্ধি ঘটলে এদের কারণে নদীনালা, খালবিলে নেমে গোসল করা, মাছ ধরা ও অন্যান্য কাজ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ত। কারণ পানিতে নামলেই ওরা আমাদের আক্রমণ করত। কামড় দিত। অতিথি পাখিরা এগুলো খেয়ে এদের সংখ্যা কমিয়ে দেয়। তাই আমরা এগুলোর আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারি। আবার বহু ফুলের পরাগ সংযোজন ঘটিয়ে বীজ ফেলে গাছপালা রক্ষা করে চলেছে এই পাখি। এভাবে ওরা পরিবেশের

ভারসাম্য রক্ষা করছে। তাহলে বলো অতিথি পাখিরা আমাদের উপকার করছে কি না?

জ্বী স্যার।

সৌরভ এ সময় দাঁড়িয়ে বলে, স্যার সজল কালকে বলেছিল, এই বিদেশি পাখিদের কি আমরা দাওয়াত করে আমাদের দেশে আনি? তাহলে ওরা অতিথি হলো কী করে?

সৌরভের কথায় স্যার হেসে ফেলে! হাত দিয়ে ইশারা করে বলে, আচ্ছা বলছি। এই বিদেশি পাখিগুলো শুধু শীতকালে সুদূর সাইবেরিয়া হতে আমাদের দেশে আসে। তখন ওদের দেশে শুধু বরফ জমতে থাকে। আবার শীত ফুরালেই ওরা ওদের বাসস্থান সাইবেরিয়াতে ফিরে যায়। কিছু দিনের জন্য শুধু ওরা আমাদের দেশে থাকে। তোমাদের বাড়িতে যদি কেউ আসে। আবার কিছুদিন থেকে চলে যায়। তোমরা তাকে কি মেহমান বা অতিথি বলো না?

সকল ছাত্র সমস্বরে বলে, জী স্যার।

স্যার তখন বলে, শুধু শীতকালীন সময়ের জন্য এই পাখিগুলো আমাদের দেশে বেড়াতে আসে বলে এদেরকে বলা হয় সময়ের অতিথি বা অতিথি পাখি।

সজল এবার দাঁড়িয়ে বলে, স্যার
আমি আজ থ
াইক্যা ওয়াদা করলাম আর গুলাইল দিয়া পাখি মারুম না। ফাঁদ পাইত্যা অদের আটকামু না।

স্যার তখন সজলের পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। বলে, সাবাস! এই তো চাই! সজল তাহলে আজকে আমার কথা বুঝতে পেরেছে। তোমাকে ধন্যবাদ!

স্যার সকলকে বলে, তোমাদের প্রত্যেক ছাত্রকেই বলছি, তোমরা কেউ অতিথি পাখি মেরো না।

ছাত্ররা সমস্বরে বলে, জ্বী স্যার আমরা অতিথি পাখি মারব না।

তারপর ছুটির ঘণ্টা বাজলে স্যার ক্লাস ছুটি দিয়ে দেয় এবং ছাত্রদের উদ্দেশে বলে, তোমরা প্রত্যেকেই আমার কথাগুলো মনে রাখবে এবং তোমাদের বাড়ির প্রত্যেককেই কথাগুলো বলবে। ■

লেখক: গল্পকার

রাজকন্যার রান্না

মীম নোশিন নাওয়াল খান

রাজ্যের নাম স্বর্ণগড়। সেই রাজ্যের রাজার দুই মেয়ে। বড়ো রাজকন্যা হীরকমালা, ছোটো রাজকন্যা স্বর্ণমালা। দুই রাজকন্যাই ভীষণ গুণী। লেখাপড়া ছাড়াও ঘোড়ায় চড়া, তীর ছোড়া, অস্ত্র চালনাসহ নানা কাজে তারা পারদর্শী। তারাই যেহেতু ভবিষ্যতে রাজ্যের দায়িত্ব নেবে, তাই রাজা তাদেরকে সবকিছুই শিখিয়েছেন। ছোটো থেকেই যেন তারা রাজ্যের যোগ্য শাসক হয়ে ওঠে। রাজ্যের দেখভালের জন্য শেখা বিদ্যা ছাড়াও রাজকন্যাদের নিজেদেরও কিছু শখ আছে।

বড়ো রাজকন্যা গান গাইতে ভালোবাসে। সে যখন গান করে, তখন গাছের পাতাগুলোও বাতাসে দোলা বন্ধ করে শান্ত হয়ে যায়। বাতাসটাও যেন বইতে ভুলে যায়। নিজের ঘরের জানালার পাশে বসে যখন সে আকাশ দেখে আর গান করে, পাখিরাও নিজেদের গান থামিয়ে গাছের ডালে চুপ করে বসে তার গান শুনতে।

ছোটো রাজকন্যা ভালোবাসে ছবি আঁকতে। তার ঘর জুড়ে রং, তুলি, আর ছবি আঁকার নানা উপকরণ। সে আঁকে পাহাড়, সমুদ্র, আর আকাশের ছবি। তার ছবিতে ফুলের উপরে শিশিরের টুকরোটাও নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে, যেন টোকা দিলেই টুপ করে ভেঙে যাবে। ছবি আঁকার জন্য রাজকন্যা প্রায়ই বাইরে যায়। নদীর পাশে বসে সে নদীর ছবি আঁকে, পাহাড় দেখতে দেখতে আঁকে পাহাড়ের ছবি।

রাজা তার দুই মেয়েকে নিয়ে ভীষণ খুশি। সারা রাজ্যের প্রজারা রাজকন্যাদের মিষ্টি ব্যবহার আর গুণের প্রশংসা করে।

একদিন ছোটো রাজকন্যা রাজার কাছে এসে বলল, বাবা, আমার মনে হচ্ছে অনেক কিছু শেখা বাকি রয়ে গেছে। আমি আরো নতুন কিছু শিখতে চাই।

রাজা বললেন, বেশ কথা। কী শিখতে চাও তুমি?

ছোটো রাজকন্যা স্বর্ণমালা বলল, সেটা আমি জানি না বাবা। তবে আমার নতুন কিছু শিখতে ইচ্ছে করছে। আমাকে যা যা শিখিয়েছ, সেগুলো তো আমি খুব ভালোই পারি। আমার ক্লান্তি চলে এসেছে এত বছর ধরে একই বিদ্যাচর্চা করে। তুমি বরং এক কাজ করো– রাজ্যে ঘোষণা দিয়ে দাও, যে, যে অনন্য দক্ষতার অধিকারী, তা যেন প্রাসাদে এসে বলে। তাহলে আমি রাজ্যের সবচেয়ে অসাধারণ দক্ষতাগুলোর কথা জানতে পারব। এরপর আমার যেটা ভালো লাগবে, সেটা আমি শিখব।

রাজা বললেন, বেশ। তবে তাই হোক।

পরদিনই রাজ্যে ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হলো, যার যা অসাধারণ দক্ষতা আছে, সে যেন রাজদরবারে এসে তা জানায় ও রাজকন্যা স্বর্ণমালাকে সেই দক্ষতা প্রদর্শন

করে। তারপর রাজকন্যার যে দক্ষতাটি সবচেয়ে ভালো লাগবে, সে সেটি শিখবে। আর যার দক্ষতা রাজকন্যার ভালো লাগবে, তাকে রাজা একশ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবেন।

ঘোষণার পর রাজ্যে শোরগোল পড়ে গেল। সবাই নিজেদের দক্ষতার কথা জানাতে রাজদরবারে আসতে লাগল। একজন জাদুকর এসে দেখালো সে কীভাবে একটা পাখিকে উধাও করে ফেলতে পারে। একজন বংশীবাদক শোনালো তার আশ্চর্য সুন্দর বাঁশির সুর। এক তরুণ এসে দেখালো সে কীভাবে পালটে ফেলতে পারে যে-কোনো ফুলের রং। এমন অনেক অদ্ভুত আর সুন্দর দক্ষতা নিয়ে অসংখ্য মানুষ এল রাজদরবারে। রাজকন্যা সবাইরই খুব প্রশংসা করল। কিন্তু কোনো দক্ষতাই তার পছন্দ হলো না।

সেই রাজ্যের এক গ্রামে থাকত এক দরিদ্র নারী আর তার মেয়ে। মেয়েটার বাবা মারা গিয়েছিল আগেই। মা আর মেয়ে তাদের তৈরি কিছু খাবার বিক্রি করে দিন চালাতো। কিন্তু তারা আয় করত সামান্য। অত অল্প আয়ে তাদের তিনবেলা খাবারই জুটত না ঠিকমতো। রাজার ঘোষণা শুনে মেয়েটি মাকে বলল, মা, আমি তো বেশ রান্না জানি। এ গ্রামে কেউ আমার চেয়ে ভালো রাঁধে না। আমি রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজকন্যাকে আমার রান্নার কথা বলি।

তার মা বলল, রাজকন্যা কি আর রান্না শিখতে চাইবে? সে তো অসাধারণ কোনো দক্ষতা শিখবে বলেছে। রান্না তো খুবই সাধারণ জিনিস রে মা।

মেয়েটা বলল, কিন্তু মা, রান্না তো খুব দরকারি দক্ষতা। রান্না না জানলে ক্ষুধা পেলে মানুষ কী খাবে?

তার মা হেসে বলল, রাজকন্যাকে রেঁধে খেতে হয় না মা। রাজপ্রাসাদে অনেক রান্নার লোক আছে। তারাই রাঁধে।

মেয়েটা কিছুক্ষণ ভেবে বলল, সে যাই হোক মা, আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখব একবার। যদি রাজকন্যা রান্না শিখতে নাও চান, হয়ত আমার রান্না খেয়ে ভালো লাগলে তিনি আমাকে রাজপ্রাসাদে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেবেন। রাজপ্রাসাদে কাজ পেলে আমরা এখানের চেয়ে অনেক বেশি আয় করতে পারব।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। পরদিন ভোর হতেই মেয়েটি মিষ্টি পাউরুটি, কেকসহ তার জানা সেরা রান্নাগুলো করে নিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে রওনা হলো। প্রাসাদে পৌঁছে রাজকন্যার সামনে খাবারের পাত্রগুলো রাখতেই রাজকন্যা স্বর্ণমালা মুগ্ধতা নিয়ে বলল, কী চমৎকার ঘ্রাণ বেরুচ্ছে খাবারগুলো থেকে! আর কী সুন্দর দেখতে হয়েছে এগুলো!

মেয়েটি বলল, রাজকুমারী, আমি জেনেছি আপনি রান্না শেখেননি কখনো। তাই আমি আপনাকে রান্না শেখার প্রস্তাব দিতে এসেছি। আপনি যদি আমার রান্না করা খাবারগুলো খেয়ে দেখেন, তবেই বুঝবেন আমার রান্নার হাত কেমন।

রাজকন্যা স্বর্ণমালা হেসে বলল, রান্না তো খুব সাধারণ একটা দক্ষতা। রান্না শেখার প্রয়োজন তো আমার হবে না মেয়ে। আমাদের প্রাসাদে অনেক রান্নার লোক আছে। আমাকে কখনো রাঁধতে হয় না। তবে তোমার রান্না নিঃসন্দেহে চমৎকার।

মেয়েটি বলল, রাজকুমারী, বলা তো যায় না কখন কোন দক্ষতা কাজে লেগে যায়। আমাদের কাছে যেগুলোকে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়, কখনো কখনো সেগুলোই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হয়।

রাজকন্যা আবার হালকা হেসে বলল, রান্না শেখার প্রয়োজন বোধ হয় আমার কখনোই হবে না। তবে তোমার রান্না খেয়ে আমি মুগ্ধ। তুমি চাইলে আমি তোমাকে রাজপ্রাসাদে রান্নার কাজে নিযুক্ত করতে পারি।

কৃতজ্ঞতায় মেয়েটির চোখে পানি চলে এল। সে ভীষণ খুশি মনে রাজকন্যাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার প্রস্তাব গ্রহণ করে সুসংবাদটা মাকে জানাতে বাড়ির পথ ধরল।

কয়েকদিন পর রাজা আর রানি রাজকার্যে কয়েকদিনের জন্য বাইরে গেলেন। দুই রাজকন্যা রইল প্রাসাদে। রাজকন্যা স্বর্ণমালা বড়ো বোন হীরকমালাকে বলল, দিদি, আমি কাল ভোরে ছবি আঁকতে পাহাড়ে যাব। সন্ধ্যা নামার আগেই প্রাসাদে ফিরে আসব।

রাজকন্যা হীরকমালা বলল, বেশ তো। তুই সঙ্গে কয়েকজন লোক আর খাবার দাবার নিয়ে যাস। আর তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস।

পরদিন ভোরে রাজকন্যা স্বর্ণমালা সঙ্গে দুজন সৈন্য নিয়ে ঘোড়ায় চেপে চলল পাহাড়ে। সাথে তার ছবি আঁকার সরঞ্জাম। সারাদিন ছবি আঁকল রাজকন্যা। এত মনোযোগ দিয়ে সে ছবি আঁকল যে খাওয়ার কথাও ভুলে গেল। শেষে সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে ডুবি ডুবি করছে, তখন তার বাড়ি ফেরার কথা মনে পড়ল।

সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে সে প্রাসাদের দিকে রওনা দিল। কিন্তু ফেরার পথে শুরু হলো বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতে চলা যায় না। সৈন্যরা বলল, রাজকুমারী, বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে।

নির্জন প্রান্তর। আশপাশে ঘরবাড়িও নেই। সৈন্যরা সেখানে তাঁবু ফেলল। রাজকন্যা স্বর্ণমালা তাঁবুর ভেতর বসে অপেক্ষা করতে থাকল বৃষ্টি থামার। হঠাৎ তার মনে পড়ল, সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। খিদে লেগে গেল খুব। খাবারের ঝুড়িতে হাত দিয়ে সে দেখল, সারাদিন গরমে থেকে খাবারগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে। ওদিকে রাজকন্যার খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। কী আর করার! সে অপেক্ষা করতে থাকল কখন বৃষ্টি থামবে আর সে প্রাসাদে ফিরে কিছু খেতে পারবে।

বৃষ্টি থেমে গেলেও পথ হয়ে গেল কাদা। তাই রাজকন্যার ফিরতে বেশ রাত হলো। বৃষ্টি হয়ে বেশ ঠান্ডা পড়েছে। আর রাজকন্যা একটু ভিজেও গেছে। সে সেই হিম রাতে কাঁপতে কাঁপতে প্রাসাদে এসে ঢুকল। তাকে দেখেই রাজকন্যা হীরকমালা চিন্তিত মুখে বলল, এত দেরি হলো কেন তোর? আমি দুশ্চিন্তা করছি এদিকে!

রাজকন্যা স্বর্ণমালা তাকে সব ঘটনা খুলে বলে। হীরকমালা বলল, ঠিক আছে। তুই আগে ভেজা পোশাকটা পালটে আয়।

পোশাক পালটেই রাজকন্যা স্বর্ণমালা ছুটে গেল খাবার টেবিলে। হীরকমালা বলল, আকাশে মেঘ দেখে রান্নার লোকেরা আগেই বাড়ি চলে গেছে। বোধ হয় ওরা তোর জন্য রান্নাঘরে খাবার রেখে গেছে। চল তো দেখি।

এই প্রথম দুই রাজকন্যা রান্নাঘরে গেল। আগে কখনোই তাদের রান্নাঘরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। রান্নাঘরের কোথায় কী থাকে- কিছুই তাদের জানা নেই। তন্নতন্ন করে খুঁজেও রান্নাঘরে তারা কোনো খাবার পেল না। শেষে হীরকমালা মাথায় হাত দিয়ে বলল, হায় কপাল! ওরা বোধ হয় ভেবেছে তুই খেয়ে আসবি বাইরে থেকেই। ওরা তো বাসি খাবার রাখে না। যা খাবার বাকি ছিল সেগুলো মনে হয় নিয়ে গেছে।

রাজকন্যা স্বর্ণমালার ওদিকে খিদেয় রীতিমতো মাথা ঘুরছে। সে দিদিকে বলল, দিদি, কাউকে একটু বলো তো আমাকে কিছু রেঁধে দিতে। আমি কিছুতেই না খেয়ে থাকতে পারব না আর।

রাজকন্যা হীরকমালা চিন্তিত মুখে বলল, রাঁধার মতো কেউ তো প্রাসাদে নেই রে বোন। বৃষ্টির আভাস পেয়ে সবাই আগে বাড়ি চলে গেছে। যারা আছে, তারাও ঘুমিয়ে পড়েছে। এত রাতে তাদেরকে ডেকে তোলা কি ঠিক হবে বলো তো? বরং একটা কাজ করি চলো। তুই আর আমি মিলেই রান্না করি আজ।

রাজকন্যা স্বর্ণমালা বলল, আমরা তো রাঁধতে পারি না দিদি!

তারপর সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এখন বুঝতে পারছি, সেদিন সেই মেয়েটা ঠিকই বলেছিল। অস্ত্রচালনা, ছবি আঁকা, ঘোড়ায় চড়া— এগুলো যেমন অসাধারণ দক্ষতা, তেমন জীবনের সাধারণ কাজগুলো করতে জানাও অসাধারণ দক্ষতা। আর সেগুলো সবারই জানা উচিত। যেগুলোকে আমরা অপ্রয়োজনীয় ভাবি, সেগুলোই কখনো কখনো সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

দুই রাজকন্যা মিলে রুটি বানাতে বসল। ময়দায় জামা মেখে ফেলল। তাদের হাত-মুখেও ময়দা আর কালি মেখে একশেষ। কীভাবে রুটি বানাতে হয় তাও তো তারা জানে না। চেষ্টা করে যাও বানালো, সেটা আর খাওয়ার উপযোগী কিছু হলো না।

ওদিকে রান্নাঘর থেকে থালাবাসনের ঝনঝন আওয়াজ শুনে প্রাসাদের দেখভালের দায়িত্বে থাকা এক নারী ঘুম ভেঙে ছুটে এল। রাজকন্যাদের রান্নাঘরে দেখে সে অবাক হয়ে জানতে চাইল কী হয়েছে। সবটা শুনে সে যত্ন করে ছোটো রাজকন্যাকে খুব দ্রুততার সঙ্গে গরম লুচি ভেজে দিল। সারাদিন পর সেই লুচি খেয়ে রাজকন্যার মনে হলো, এ যেন অমৃত। খেতে খেতেই সে নারীকে বলল, নতুন যে রান্নার মেয়েটাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, কাল সকালেই তাকে আমার সাথে দেখা করতে বলবে। তার কাছ থেকে আমি রান্না শিখব। সে ঠিক বলেছে। কোনো দক্ষতাই অপ্রয়োজনীয় নয়। বরং অসাধারণ কিছু খুঁজতে গিয়ে আমরা সত্যিকারের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোই ভুলে যাই, যেগুলো আমাদের জীবনে সবচেয়ে বেশি দরকার। ■

লেখক: শিক্ষার্থী ও গল্পকার

প্রজাপতির ডানা

অনুবাদঃ মোস্তাফিজুল হক

‘মন বনকে চোখের চেয়েও ভালো করে দেখায়। মন যা দেখায় তা নিছক প্রতারণা নয়।’ - এইচ এম টমলিনসন

অ্যামাজন নদীর তীরে জঙ্গলের খোলা জায়গায় চিমিডিউ নামে এক মেয়ে বাস করত। সে তার পরিবার ও স্বজনদের সাথে মলোকা নামক বড়ো তাঁবুতে থাকত।

মলোকার ছেলেরা পুরুষদের সাথে মাছ ধরা আর শিকারের কাজে সময় দিত। চিমিডিউ ও অন্যান্য মেয়েরা গৃহস্থালি ও কৃষিকাজে মহিলাদের সাহায্য করত। অন্যান্য মেয়ের মতো চিমিডিউ কখনোই বনের দিকে পা বাড়ায়নি। সে জানত যে বন ভয়াবহ প্রাণী ও ক্ষতিকর আত্মায় পরিপূর্ণ। আর এখানে হারিয়ে যাওয়া কতটা সহজ।

তবুও বড়োরা যখন সেসব অচেনা জগতের গল্প বলতেন, তখন সে মুগ্ধ হয়ে তা শুনত। আর সে মাঝে মাঝে কল্পনায় বনের ভেতরে ঢুকে যেত। তখন দানবীয় গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবত– ‘আরো কিছু খুঁজে পাবো’।

চিমিডিউ একদিন বসে বসে ঝুড়ি তৈরি করছিল। তখন সে দেখল, বড়ো একটা প্রজাপতি ঠিক ওর সামনে উড়ে বেড়াচ্ছে। সূর্যের আলোয় ওটার নীলডানা ঝলমল করে নেচে চলেছে।

চিমিডিউ সুরেলা কণ্ঠে বলল, ‘তুমি জগতের সবচেয়ে মোহিনী প্রাণী। আমিও তোমার মতো হতে চাই।’

তবে সেই প্রজাপতি জিজ্ঞাসার গভীরে হারিয়ে খোলা মাঠের দিকে উড়ে গেল!

চিমিডিউ তার ঝুড়িটি নিচে রেখে অলস ডানা মেলে দিয়ে প্রজাপতির মতো উড়ার অনুকরণ শুরু করল। সে যে গাছগুলোকে খেয়াল করত, সেসব গাছ নেড়েচেড়ে ওঠে ঘূর্ণিবায়ু ছড়িয়ে দিল।

চিমিডিউ দীর্ঘসময় এমনটা করল। এমনকি প্রজাপতিটা যতক্ষণ আঙুরলতার ফাঁক দিয়ে অদৃশ্য না হলো! সে হঠাৎ বুঝতে পারল বনের অনেক ভেতরে চলে এসেছে। কোনো পথ জানা নেই! উঁচু গাছগুলো পাতা দিয়ে চাঁদোয়া তৈরি করে সূর্যকে আড়াল করে রেখেছে। সে কোন পথে এসেছিল, তাও মনে করতে পারল না!

‘মা-আ-আ! বাবা-আ-আ!’ বলে সে চিৎকার করল! কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না।

সে বিড়বিড় করে বলল, ‘ওহ! না, আমি কীভাবে ফিরে যাব?’

চিমিডিউ উপায় না দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পথ খুঁজতে লাগল। খানিক পরে সে ঠকঠক শব্দ শুনতে পেল। সে আশাবাদী হয়ে ভাবল, ‘নিশ্চয়ই বনে কেউ কাজ করছে।’ তাই সে শব্দটা অনুসরণ করতে লাগল। কিন্তু সে কাছে গিয়ে শুধুই একটা কাঠঠোকরা পাখিকে দেখতে পেল!

চিমিডিউ দুঃখে মাথা নাড়ল। সে বলল, ‘তুমি যদি মানুষ হও, তবে আমাকে বাড়ির পথ দেখাও।’

‘কেন আমাকে মানুষ হতে হবে? আমি আমার মতো করে তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবো!’ কাঠঠোকরা পাখি রাগের সাথে বলল।

চিমিডিউ কথা শুনে চমকে উঠলেও আনন্দে আগ্রহের সাথে বলল, ‘ওহ, তুমি পথ দেখাবে?’

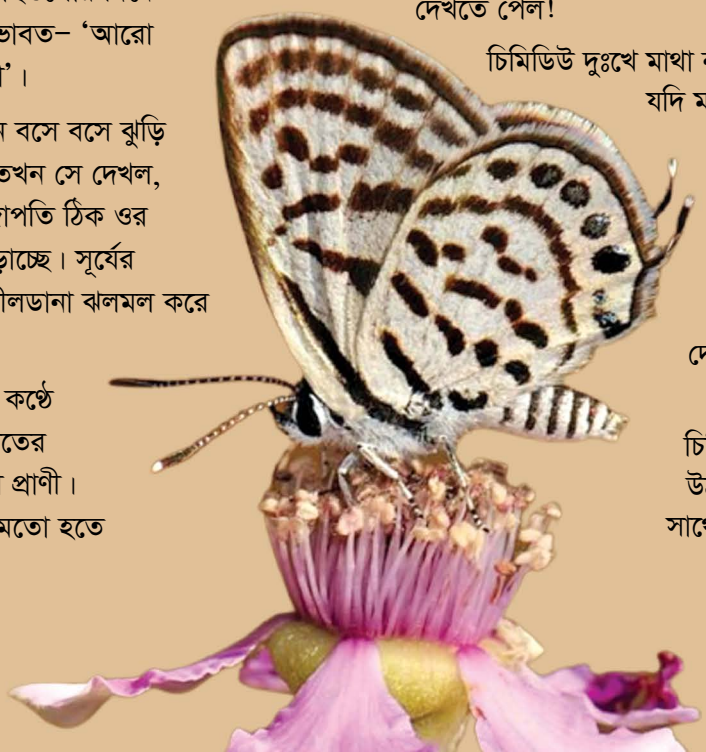

‘তুমি দেখতে পাচ্ছ না, আমি ব্যস্ত? তোমরা মানুষেরা খুবই দাম্ভিক! তোমরা ভাবো যে, সবাই তোমাদের সেবা করার জন্যই এখানে এসেছে। বনের একটা কাঠঠোকরা পাখিও মানুষের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।’ বলেই পাখিটা উড়ে গেল।

চিমিডিউ আনমনে বলতে থাকল, ‘আমি কোনো খারাপ কথা বলিনি। শুধু বাড়ি ফিরে যেতে চেয়েছি।’

এবার চিমিডিউ আগের চেয়েও অস্থির হয়ে উঠল। আরো কিছুদূর হেঁটে সে একটা মলোকার কাছে এসে দেখতে পেল, একজন নারী চটের দোলনায় বসে আছে।

চিমিডিউ খুশিতে একজন বয়স্ক নারীকে সম্মান জানিয়ে হাঁক ছাড়ল, ‘দাদিমা, তোমাকে পেয়ে আমি খুব খুশি! ভয়ে ছিলাম যে, আমি জঙ্গলেই মারা যাবো!’

কিন্তু সে যখন মলোকায় পা রাখবে, তখন সেটা ফাঁক হয়ে গেল। মলোকা আর বুড়ি একসাথে হাওয়ায় উড়ে গেল। তখন চিমিডিউ দেখতে পেল, ওটা সত্যি সত্যিই একটা টিনামৌ পাখি। যা কিনা জাদুবলে বুড়ির রূপধারণ করেছিল। পাখিটা গাছের মগডালে উড়ে গিয়ে বসল।

‘তুমি আমাকে দাদিমা বলবে না! তোমার স্বজনেরা আমাদের কতজনকে শিকার ও হত্যা করেছে! তুমি কত রান্না খেয়েছ! তুমি আমার কাছে সাহায্য চাওয়ার সাহসই দেখাতে পারো না।’ কথাগুলো বলেই এবার টিনামৌ পাখিটা পালিয়ে গেল।

চিমিডিউ দুঃখে বলতে থাকল, ‘এখানকার প্রাণীরা মনে হয় আমাকে ঘৃণা করে। তবে আমি কী মানুষের সাহায্য পেতে পারি না!’

চিমিডিউ আরো বেশি আশাবাদী হয়ে ঘুরতে থাকল। তার খিদেও লেগেছে। হঠাৎ মাটিতে একটা সরোভা ফল পড়ল। সে ওটা তুলে নিলো। লোভ সামলাতে না পেরে খেয়েও নিলো। তারপর কাছেই আরেকটা ফল পড়ল। চিমিডিউ দ্বিধান্বিত হয়ে উপরের দিকে তাকালো। সে দেখতে পেল ধূর্ত বানরের দল অরণ্যের উঁচুতে ফল খাচ্ছে। তারপর আরো একটি ফল বানরের হাত ফসকে পড়ে গেল।

চিমিডিউ মনে মনে বলল, ‘আমি শুধু বানরদের অনুসরণ করব, তবেই আমি অনাহারে থাকব না।’ সেদিনের বাকি সময়টা বানরদের অনুসরণ করেই চলতে লাগল। তারা যে ফল ফেলেছিল তা-ই খেয়েছিল। কিন্তু দিনের আলো ফিকে হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে রাতের জঙ্গলে তার বিপদের আশঙ্কা তাজা হয়ে উঠল।

গভীরতর অন্ধকার। চিমিডিউ দেখল, বানরগুলো নিচে নামতে শুরু করেছে। সে নিজেকে লুকাতে চাইল, যাতে না দেখা যায়। তাকে বিস্মিত করে বানরেরা মাটিতে নেমেই একে একে মানুষের রূপ ধারণ করল।

চিমিডিউ হাঁফ ছাড়ার সুযোগ পেল না। মুহূর্তের মধ্যে মানুষরূপী বানরেরা তাকে ঘিরে ফেলল।

‘আরে, এ যে চিমিডিউ! তুমি এখানে কী করছ?’ পরিচিত কণ্ঠে এক বানর মানুষ বলল।

চিমিডিউ গড়বড় করে বলল, ‘আমি এক প্রজাপতির পিছু নিয়ে বনে ঢুকে পড়েছি। আমি আর বাড়ির পথ খুঁজে পাচ্ছি না।’

নারীরূপী এক বানর বলল, ‘দুর্ভাগা মেয়ে! চিন্তা করো না। আমরা তোমাকে আগামীকাল বাড়ি পৌঁছে দেবো।’

‘ওহ, আপনাকে ধন্যবাদ! তবে আজ রাতে কোথায় থাকব?’ চিমিডিউ কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল।

‘তুমি আমাদের সাথে উৎসবে যাবে না? আমাদের বানর রাজার তরফ থেকে যে দাওয়াত হয়েছে!’ বানর মানব জানতে চাইল।

তারা শীঘ্রই একটি বড়ো মলোকায় পৌঁছালো। বানর রাজা চিমিডিউকে দেখে বললেন, ‘মানুষ হয়েও তুমি কেন বিনা দাওয়াতে এসেছ?’

বানরী বলল, ‘আমরা তাকে খুঁজে পেয়ে সাথে করে নিয়ে এসেছি।’

বানর রাজা খুশি হয়ে আর কিছু বললেন না। তবে তিনি এমনভাবে দেখছিলেন, যা চিমিডিউকে ভয়ে কাঁপিয়ে তোলার মতো।

মানবরূপী আরো বহু বানর হাজির হলো। কারো

কাঠের মুখোশযুক্ত পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি পোশাক। আবার কেউ কেউ কালো জেনিপার রঙে তাদের মুখে নকশা এঁকেছে। সবাই লাউয়ের খোসায় রাখা বিশেষ পানীয় পান করছে।

তারপর কেউ কেউ বানর রাজাকে মাথায় তুলে নাচতে শুরু করল। তারা মলোকার ভেতরে মশাল জ্বেলে আলো ছড়ালো। ডুগডুগি আর কাঠির সুর তরঙ্গও ছড়ালো। অনেকেই হাড়ের বাঁশি বাজিয়ে করুণ সুরে গান গাইল।

চিমিডিউ অবাক হয়ে সব দেখল। সে তার বন্ধুবৎসল বানরীকে বলল, 'এটা ঠিক আমাদের উৎসবের মতো!'

রাতের শেষদিকে সবাই উৎসব থেকে বিদায় নিল। বানর রাজার নাক ডাকার শব্দে চিমিডিউ জেগে রইল। একটু পরে সে তার কান চেপে ধরল। চিমিডিউ মনে মনে বলল, 'খুব অদ্ভুত! শব্দটা কথার মতো শোনাচ্ছে যে!'

সে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনল, 'আমি চিমিডিউকে খেয়ে ফেলব। চিমিডিউকে খেয়ে খেলব...।'

'দাদু!' বলেই সে ভয়ে কেঁদে উঠল।

'কী? কে?' বানর রাজা ঘুম ভেঙে বলে উঠলেন।

সে বলল, 'আমি চিমিডিউ। তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বলছিলে আমাকে খেয়ে ফেলবে!'

'আমি কীভাবে তা বলতে পারি? বানরেরা তো মানুষ খায় না! না, এটা আমার মুখের ফালতু কথা! এসব কথায় মনোযোগ দিও না!' এই বলে বানর রাজা বিশেষ পানীয়র একটা বড়ো বোতল নিয়ে ঘুমাতে গেলেন।

একটু পরই সে আবার শুনতে পেল, 'আমি চিমিডিউকে খেয়ে ফেলব। চিমিডিউকে খেয়ে ফেলব...।' এবার আগের চেয়েও বেশি গর্জন করে বলছিল। চিমিডিউ বানর রাজার বিছানার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর ভয় বেড়ে গেল। এটা মোটেই কোনো বানর মানুষ নয়। কালো ছোঁপযুক্ত শক্তিশালী প্রাণীকেই দেখতে পাচ্ছে সে।

বানর রাজা মোটেও বানর নয়। ওটা হলো চিতাবাঘ! তাই চিমিডিউয়ের হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। সে খুব নীরবে বিছানা থেকে উঠে বসল। তারপর একটা মশাল নিয়ে সারারাত দিগভ্রান্তের মতো বনে দৌড়ালো।

চিমিডিউ যখন থামল, তখন বনের ঘন ছাউনি ভেদ করে দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ছে। সে কাপোক গাছের নিচে বসে কাঁদতে লাগল।

‘আমি এই বনকে ঘৃণা করি! আমার বোধশক্তি কাজ করছে না!’ সে মনের কষ্টে বলল।

‘সত্যিই কি?’ কোমল কণ্ঠে কেউ একজন জানতে চাইল।

চিমিডিউ তাড়াতাড়ি চোখ মুছে তাকালো। কাপোকের ডালে সবচেয়ে বড়ো সেই মর্ফো প্রজাপতি, যা সে আগেও দেখেছিল। তাকে দেখে সেই প্রজাপতিটা উজ্জ্বল নীল ডানা দোলাচ্ছে।

চিমিডিউ বলল, ‘ওহ! দাদিমা, কিছুই বুঝতে পারছি না। এখানে সবকিছুই কেমন যেন পরিবর্তনশীল!’

প্রজাপতি ফিসফিস করে বলল, ‘প্রিয় চিমিডিউ, এটাই বুনোপথ। তোমার চেনাজানা মানুষের মাঝে পররিবর্তনগুলো ধীরে ধীরে হয়। ফলে ওগুলো প্রায়ই যা আছে তাই-ই দেখায়। কিন্তু তোমার জগতটা খুবই ছোট্ট। চারপাশের বিশাল পৃথিবীর কাছে তুমি একই রকম আচরণ আশা করতে পারো না।’

চিমিডিউ চিৎকার করে বলল, ‘আমি যদি বন বুঝতেই না পারি, তবে কীভাবে বাড়ি ফিরে যাব?’

‘আমি তোমাকে নিয়ে যাব,’ প্রজাপতি বলল।

‘দাদিমা, তুমি কি পৌঁছে দিতে পারবে?’ চিমিডিউ বলল।

‘অবশ্যই। শুধু আমাকে অনুসরণ করো।’

তারা অল্পদিনেই অ্যামাজনের তীরে এসে পৌঁছালো। তখন চিমিডিউ অবাক হয়ে দেখল, লোকেরা নদীর অন্য প্রান্তে নৌকো ভেড়াচ্ছে। তা দেখে সে বলল,

‘এই নদী পার হওয়ার উপায় আমার জানা নেই ! এটা পার হওয়াও যে অসম্ভব!’

‘অসম্ভব?’ প্রজাপতি বলল।

চিমিডিউ সচেতন ছিল। তাই সে বলল, ‘আমি বলতে চাচ্ছি, কীভাবে কী করতে হবে বুঝতে পারছি না। তা কীভাবে এই নদী পার হবো?’

‘এটা পার হওয়া খুব সহজ। আমি তোমাকে প্রজাপতিতে রূপান্তরিত করব। তোমাকে চারবার এই কথাটা বলতে হবে-

শবনম পান করি,
নীলরং ডানা গড়ি।’

মন্ত্র পড়ার পর চিমিডিউ নিজেকে খুব বেশি ছোটো অনুভব করল। তার বাহু প্রশস্ত ও পাতলা হয়ে গেল! সেও মর্ফোর পাশে উড়ে উড়ে দ্রুত বেগে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

‘আমি প্রজাপতি!’

নদীর প্রশস্ত জলের ধারা অতিক্রম করে উড়ে গেল। ডানাগুলো রোদে ঝলমল করতে থাকল। চিমিডিউ বলতে লাগল–

‘আমি নিজেকে খুব কমনীয় আর ঝলমলে বোধ করছি। আমার ধারণা এই অনুভূতি কখনোই ফুরিয়ে যাবে না।’

খুব শীঘ্রই তারা মলোকার পথে পৌঁছে গেল। মুহূর্তেই চিমিডিউ মাটি ছুঁলো। সে পুনরায় মানবরূপ ধারণ করল।

প্রজাপতি বলল, ‘তোমাকে রেখে গেলাম। শুভ বিদায় চিমিডিউ।’

মেয়েটি বলে উঠল, ‘ও দাদিমা, আমাকে তোমার সাথে নিয়ে যাও। আমি চিরকাল প্রজাপতি হয়েই থাকতে চাই!’

প্রজাপতি জবাবে বলল, ‘এটা ঠিক হবে না। তোমার আপনজন আছে, যারা তোমাকে ভালোবাসে ও তোমার যত্ন নেয়। চিমিডিউ, কিছু মনে করো না, তুমি আমাদেরও একজন হয়ে গেছ। বনের কিছু একটা সবসময় তোমার সাথেই আছে।’

প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে আর মেয়েটি হাত নেড়ে বলে চলল, ‘শুভ বিদায়, দাদিমা!’

অবশেষে চিমিডিউ প্রজাপতির ডানাওয়ালা মন নিয়ে ঘরে ফিরে এল। ■

মূলগল্প: দ্য উইংস অব দ্য বাটারফ্লাই
মূল গল্পকার: অ্যারন শেপার্ড

চড়ুইয়ের তৃষ্ণা

শাম্মী তুলতুল

চড়ুই পাখি বেরিয়েছিল ছানাপোনাদের জন্য খাবার আনতে। কিন্তু খাবার আনতে গিয়ে আজ বড্ড দেরি করে ফেলেছে। এসে পড়েছে অনেক দূরে। তাই ঘরে যেতে সময় লাগবে অনেক।

এদিকে তার বড়োই পিপাসা পেয়েছে। গলা শুকিয়ে গেছে। শব্দও করতে পারছে না। একটু পানির আশায় ছুটছে তো ছুটছে। ছুটছে তো ছুটছে।

চারপাশে তাকিয়ে দেখে কোথাও নদী নেই, খাল নেই, বিল নেই। নেই কোনো কুয়া। একটু গলা ভেজাবে এমন কোনো আশার আলো নেই। মনটা বেজায় খারাপ হয়ে গেল তার। তৃষ্ণায় গলা যায় যায়।

কী হবে এখন? ভেবে তো আর কিছু হবে না, পানি চাই পানি। এই ভেবে গাছ ছেড়ে ঝিমানো শরীর নিয়ে দিলো আবার আকাশে উড়াল পানির খোঁজে।

উড়ছে তো উড়ছে। দেখে রোদে পুড়ছে চারপাশ। কড়া রোদ। মাঠঘাট ফেটে চৌচির। রাখাল বালক মাঠে গরু চড়িয়ে অসহায় চোখে আকাশের দিকে তাকায়। পথিক কপালের ঘাম মাটিতে ফেলে একটু জিরোয়। পথিকের ঘাম মাটির উপর পড়তেই মাটি আঁতকে ওঠে। তাকে দেখে মাটির খুব মায়া হলো। বলে, হায় আমার শরীর তো ফেটে খান খান। কিন্তু এদের কী হবে? এদের তো মহাবিপদ। ইস্ একটু বাতাস একটু বৃষ্টি হলেই ভালো হয়। চড়ুই সেই মাটিতে শোঁ করে এসে পাখা ঝাপটিয়ে বসে।

মাটি বলে, তুমি এখানে কেন?

পিপাসা পেয়েছে খুব। কোথাও নদীর দেখা নাই।

আমরাও মহা মুশকিলে আছি। দেখো একটু এগিয়ে পাও কী না কিছু।

তাই করছি। চড়ুই আবার দিলো উড়াল। উড়ছে তো উড়ছে, ছোটো ছোটো চোখে অসহায় হয়ে চারদিকে তাকায়। আহা পানি, একটু পানি চাই। যেতে যেতে দেখা হয়ে গেল হাঁসের সাথে। হাঁস তার ছানাদের নিয়ে হাঁটছে তো হাঁটছেই। কোনো দিকে নজর নেই।

চড়ুই বলে, কোথায় যাও।

পানি খেতে যাই। পানির খোঁজ করি। চড়ুই চমকে গেল হাঁসেরও পানির খোঁজ দেখে।

চড়ুই পড়ে গেল মহাবিপদে। বার বার ঢোক গিলে। তার ছানাদের কথা ভেবে খুব মন খারাপ হচ্ছে। কী করছে, কেমন আছে কে জানে। তাদেরও পেট কাঁদছে জানি। সময় তো আর কম হলো না। চড়ুই ভাবতে থাকে আর উড়তে থাকে। উড়তে উড়তে হঠাৎ চোখে পড়ে গেল একটা নদী। আহা পানি। দেখেই মহাখুশি চড়ুই।

নদীর সামনে গিয়ে তার মন খারাপ হয়ে গেল। নদীর পানি একদম শুকিয়ে গেছে। পানিতে বালি দেখা যায়। তবুও কিছুই করার নেই। যখন চড়ুই এই পানি খেতে যাবে তখন জলপাখি এসে বলে, দাঁড়াও ওগুলো খেও না। আমার কাছে পানি আছে।

চড়ুই বলে তুমি কে?
আমি জলপাখি।
এখানেই থাকো বুঝি ?

হ্যাঁ। জলেই থাকি জলেই খাই। জলই আমার সব। নদীর পানি একদম শুকিয়ে গেছে গরমে। কিছু পরিষ্কার পানি আমার কাছে রেখে দিয়েছি সেটাই খাও।

দাও দাও। চড়ুই মহা আনন্দে কিচকিচ- কিচকিচ করে পানি খেলো।

জলপাখির দেওয়া পানি পান করা শেষ হলে নেচে নেচে দিলো আকাশে উড়াল। আর মুখে করে নিয়ে গেল ছানাপোনাদের জন্য খাবার। ■

লেখক: শিক্ষার্থী ও গল্পকার

আকিব হোসেন, ৫ম শ্রেণি, গালিমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, নবাবাগঞ্জ, ঢাকা

তুষিমণির বেড়াতে যাওয়া

সারমিন ইসলাম রত্না

শাঁ শাঁ শব্দ করে ট্রেন ছুটছে। বাতাসে উড়ছে তুষিমণির চুল। তুষিমণি গ্রামে বেড়াতে যাচ্ছে। আর দুলে দুলে ছড়া পড়ছে।

ঝক ঝকা ঝক ট্রেন চলেছে
ট্রেন চলেছে
ঐ ট্রেনের বাড়ি কই?

বাবা বললেন, ট্রেনের বাড়ি স্টেশনে। তুষিমণি অবাক হয়ে বলল, ট্রেন ওখানে কী করে? আম্মু বললেন, ট্রেন ওখানে থামে, যাত্রী নামায়। আবার নতুন যাত্রী নিয়ে ওখান থেকেই ছাড়ে। তুষিমণি বলল, হুম বুঝতে পেরেছি। বাবা তুষিমণিকে ধানক্ষেত দেখালেন। মামনি ঐ দেখো সোনালি রঙের ধানক্ষেত। ধান বাতাসে দুলছে। ধান থেকে চাল হয়। চাল রান্না করলে ভাত হয়।

তুষিমণি হঠাৎ বলে উঠল, আমিও বড়ো হলে আম্মু হবো। আম্মু হাসছো কেন? তুমি না সেদিন বললে আমার মতো ছোটো ছিলে। বড়ো হয়ে আম্মু হয়েছ। তাহলে আমিও হবো হি হি। এমনি গল্প করতে করতে ওরা গ্রামে পৌঁছল।

তুষিমণি গ্রাম দেখে অবাক! চারিদিকে কত গাছ, কত পাখি। কত ফুল, কত ফল। নানু উঠোনে দাঁড়িয়ে আছেন। তুষিমণি ছুটে গিয়ে নানুকে জড়িয়ে ধরল। মিষ্টি করে বলল, নানু। এতদিন পর নাতনিকে দেখে নানু মহাখুশি। তুষিমণি বলল, নানু তোমার চুল এমন সাদা হলো কী করে? নানু হাসতে হাসতে বললেন, আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি তাই। ওহ্ সাদা চুল কত সুন্দর! আমার চুল সাদা হবে কীভাবে? তুমি তো এখনো ছোটো মামনি। কে বলেছে আমি ছোটো? বড়ো হয়েছি বলেই তো স্কুলে ভর্তি হয়েছি। তুষিমণির কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। তুষিমণি বলল, নানু তোমার বাড়িটা কত সুন্দর! চারিদিকে গাছ আর গাছ। একটা গাছে তুষিমণির চোখ আটকে গেল। নানু গাছে বাদামি রঙের ঝুড়ি! নানু বললেন, ওটা বাবুই পাখির বাসা। বাবুই পাখি খড়কুটো দিয়ে মাত্র তিন-চার দিনেই বাসা তৈরি করতে পারে। তুষিমণি চোখ দুটো কপালে তুলে বলল, ওয়াও!

নানু হরেক রকম পিঠা খেতে দিলেন। ভাপা পিঠা, পুলি পিঠা, পোয়া পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা, চিতই পিঠা। তুষিমণি পিঠা খেতে খেতে বলল, নানু পিঠার গাছ তো দেখলাম না। নানু এক গাল হেসে বললেন, পিঠা নানু তৈরি করেছে। পিঠার কোনো গাছ হয় না। তুষিমণি বাবার সাথে গ্রাম দেখতে বের হলো। সবুজ আর সবুজ, মিষ্টি মিষ্টি রোদ, ঝিরিঝিরি বাতাস। তুষিমণির ভীষণ ভালো লাগছে। হাঁটতে হাঁটতে বাবা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। মামনি দেখো হলুদিয়া নদী। তুষিমণি বলল, হলুদিয়া নদী! আমার নদী। আমার গ্রামের নদী। বাবা-মেয়ে নৌকায় উঠল। হেলেদুলে চলছে নৌকা। মাঝি ভাই গান ধরেছে। মাঝি বাইয়া যাও রে...। হাসি আনন্দে, নরম নরম আলো ছায়ায়, সবুজের মায়ায় কেটে গেল বেশ কিছুদিন।

চলে এল ফেরার সময়। নানুর চোখে পানি। তুষিমণি বলল, নানু আমরা আবার বেড়াতে আসব। তুমিও আমাদের বাসায় বেড়াতে যেও। কেমন? ঘণ্টাখানিক পর ট্রেন ছেড়ে দেবে। নানু এগিয়ে দিতে এসেছেন। পথে যেতে যেতে তুষিমণি একটা গাছ দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরে বাবা কত বড়ো গাছ! আম্মু বললেন, ওটা খেজুর গাছ। ঐ যে দেখো খেজুর গাছে রসের হাড়ি। বাবা বললেন, বিকেলবেলা কেউ একজন গাছে ওঠে। গাছের উপরের দিকে একটু কেটে দেয়। ঐ কাটা অংশ থেকেই সারারাত হাঁড়িতে ফোটা ফোটা রস পড়ে। সবাই খেজুরের রস খেল। তুষিমণি বলল, ওহ খেজুরের রস কত মজা! বাসায় ফিরে আমিও একটা খেজুর গাছ লাগাবো। ■

লেখক: শিশু সাহিত্যিক

সানজিদা আক্তার রুপা, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, সাউথ সন্দ্বীপ আবেদা ফয়েজ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম

ভূত সমাচার

শুচিস্মিতা ঘোষ

গত বছর শীতের শুরুতে আমি ভূতের দেশে গিয়েছিলাম। অনেক দিন হেসে খেলে তাদের সঙ্গে দিন কাটিয়েছি। বিচিত্র রকমের ভূত সেখানে বাস করে। তাদের নিয়ে আমাদের পৃথিবীতে বহুকাল ধরে নানা লোকগাঁথা, গল্প, উপন্যাস, সিনেমা, নাটক তৈরি হয় তা তারা কিচ্ছু জানে না। শোনার পর খুশিতে কেমন ডগমগ হয়ে গিয়েছিল সবাই। না দেখলে বিশ্বাস হয় না। আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেই ফেলেছিল এক বৃদ্ধ ভূত। আজকে খানিকক্ষণ তাদের গপ্পো করি।

ভূতের রাজা ব্রহ্মগুপ্ত মহাশয়। ভূত সমাজে গণতন্ত্র কিন্তু বেশ শক্তপোক্ত। গত বছর মাত্র তিনখানা ভোটে জয়ী হয়ে তিনি রাজা নির্বাচিত হয়েছেন। টিংটিঙে স্বাস্থ্যের জন্য অনেকেই ওনার শাসন মানতে চান না। সেই জন্য ব্রহ্মগুপ্ত মহাশয় বেশ ভারিক্কি ভাব নিয়ে থাকেন। এখনো বিয়ে থা করেনি।

রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দরি পেতনি লবঙ্গলতিকা। ইনি প্রতিদিন তিন সের গাধার দুধ দিয়ে রুপচর্চা করেন। মখমলের বিছানা ছাড়া তিনি ঘুমান না। রাজার প্রিয়ভাজন হওয়ায় তার খুব ভাব। লবঙ্গলতিকা জানেন কিছুদিনের মধ্যেই তিনি রানি হবেন। তাই এখন থেকেই হম্বিতম্বি শুরু করে দিয়েছেন রাজ্যে।

ভূত আর মানুষের মাঝামাঝি পর্যায়ের জীব হলো ভূনুষ। ভূত+ মানুষ = ভূনুষ। ভূত সমাজে এদের বেশ সম্মানের চোখে দেখা হয়। সভা সমিতিতে সভাপতির আসন তাই এদের দখলেই থাকে। ভূনুষ চমৎকার তবলা বাজায়। রাজার মনমেজাজ খারাপ থাকলে তিনি ভূনুষকে ডেকে পাঠান তবলা শোনার জন্য।

ভূততত্ত্ব, ভূতদের প্রাচীন সভ্যতা ও স্থাপনা, বিগত শতাব্দীতে মানুষ ও ভূতের পারস্পরিক সহাবস্থান ইত্যাদি খটমট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন পণ্ডিত ভূত। ইনি গতমাসে শ্যাওড়া গাছে একটা পাঠশালা খুলেছেন। ছেলে-মেয়েদের প্রতি মাসে তিনি কিশোর আলো পত্রিকা পড়তে দেন। ব্রহ্মগুপ্ত মহাশয় প্রথমে এতে আপত্তি তুলেছিলেন। মানুষদের বাচ্চাকাচ্চা আর ভূতের ছানাপোনা একই পত্রিকা পড়বে ব্যাপারটা অপমানজনক। পরে পণ্ডিত তাকে বুঝিয়েছেন জ্ঞানের কোনো ভেদাভেদ নেই।

আরেকজন আছেন গোবেচারা ভূত। মানুষকে ভয় দেখাতে পছন্দ করেন না। দিনরাত আদাড়ে বাদাড়ে ঘুরে বেরিয়ে ঘাস খান। খানিকটা বেকুব প্রকৃতির। রাজা পণ্ডিতকে বলেছেন বুড়ো বয়সে তাকেও পাঠশালায় ভর্তি করতে। সেই জন্য এই বেচারা খুবই ভয়ে আছে। ■

৯ম শ্রেণি, ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ

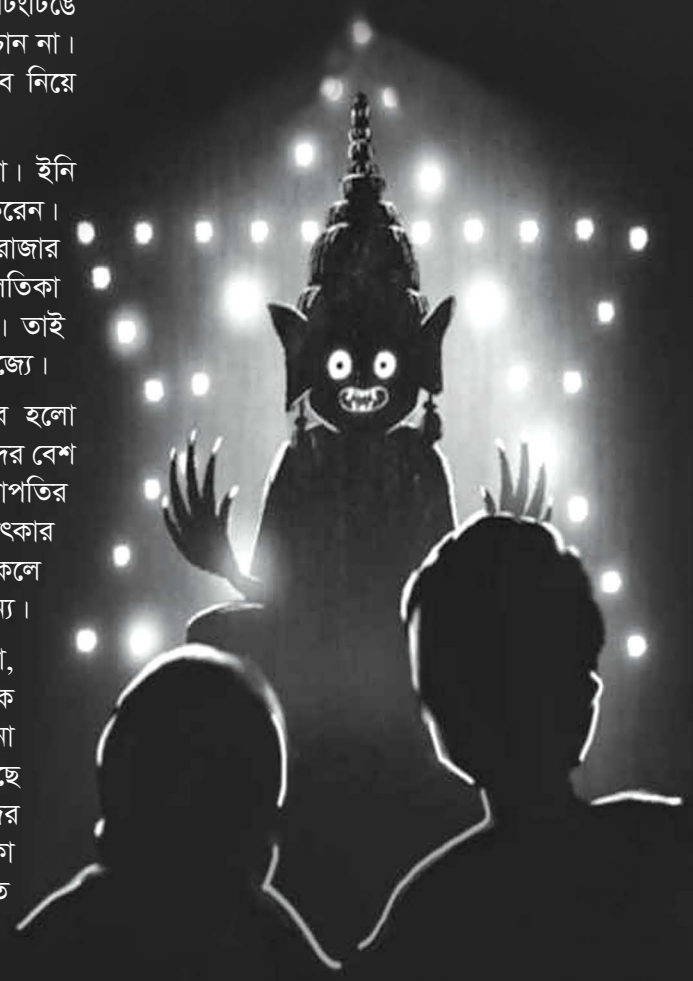

স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর কিছু উপায়

মো. তানভীর ইসলাম

সকালে কী দিয়ে নাশতা করেছি ? বাসা থেকে বের হয়েছি দরজাটা বন্ধ করেছি কিনা ? পরেরদিন কোথাও কোনো প্রোগ্রাম আছে?
ফ্যানের সুইচ কি অন করা ?
অনেকেই মনে করার চেষ্টা করেও মনে করতে পারছেন না।
তো এই লেখাটি আপনার জন্য!
উপরের এ রকম যদি কিছু হয়,তাহলে মনে করবেন আপনার ভুলে যাওয়ার প্রবণতা আছে। ভুলে যাবার প্রবণতা কি আপনার একার?

না! ভুলে যাওয়ার প্রবণতা সবারই আছে। এটা স্বাভাবিক। খাদ্যাভ্যাস, বয়সের তারতম্যসহ নানা কারণে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। শিক্ষার্থীরাও অনেকে এ সমস্যায় ভোগে। মানসিক চাপ, বিষণ্নতা বা উদ্বেগজনিত রোগ থাকলে এটি দেখা যায়। অনেক সময় আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত হলেও এটি দেখা যায়। তাছাড়া সব সময় এক চিন্তা নিয়ে থাকলেও এটি দেখা যেতে পারে। স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার কিছু কারণও আছে। এগুলো হলো চিন্তা,অতিরিক্ত ধূমপান, মানসিক চাপ ,উদ্বেগজনিত রোগ প্রভৃতি। বয়স বেশি হওয়ার সাথে সাথে এটি দেখা যায়।

তাহলে এখন প্রশ্ন হলো, এটি থেকে কি পরিত্রাণ পাওয়া যাবে?

হ্যাঁ ! যাবে। তো চলো জেনে নেই, স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর ৯টি কার্যকারী টিপস!

প্রতিদিনের খাবার তালিকায় মস্তিষ্কের খাবার রাখুন

আমাদের দেহের চালক মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক আমাদের পুরো দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে। মস্তিষ্ককে তাজা রাখতে গ্রিনটি খেতে পারেন। তাছাড়া খাদ্য তালিকায় শাকসবজি রাখতে হবে। ব্লুবেরি প্রকৃতির অন্যতম সেরা উপাদান। এক গবেষণায় দেখা গেছে, কোনো ব্যক্তি যদি নিয়মিত ১২ সপ্তাহ ব্লুবেরি জুস পান করে তাহলে তার স্মৃতিশক্তি পূর্বের থেকে বৃদ্ধি পায়। আর যদি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খান তাহলে আপনার স্মৃতিশক্তি এবং চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। তাছাড়া স্মৃতিশক্তি বাড়াতে মসুর ডাল খেতে পারেন। মসুর ডাল মস্তিষ্কের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। চিনি, কার্বোহাইড্রেট, অতিরিক্ত কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার এড়িয়ে যাবেন।

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন

স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করতে ওজন নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা অপরিসীম। দিন দিন যদি আপনার ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে নিয়মিত ব্যায়াম করুন। একজন স্বাস্থবান মানুষ সব সময় অস্বস্তি অনুভব করে। সব

সময় অস্বস্তি অনুভব করাটাও কিন্তু স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার একটা অন্যতম কারণ। ওজন নিয়ন্ত্রণে থ াকলে আপনি সবসময় কর্মক্ষম থাকবেন। আপনার স্মৃতিশক্তি পূর্বের থেকেও বৃদ্ধি পাবে।

পর্যাপ্ত ঘুম

স্মৃতিশক্তি বাড়াতে পর্যাপ্ত ঘুমের কোনো বিকল্প নেই। মানুষ যখন ঘুমায় তখন তার মস্তিষ্কে হিপোক্যাম্পাস অংশে নতুন নিউরন কোষ জন্মায়। যার ফলে আমাদের স্মৃতিশক্তি পূর্বের থেকে অনেক বৃদ্ধি পায়। তাই প্রতিদিন অন্তত ৭ ঘণ্টা ঘুমান। আপনার যদি কোনো একদিন ঘুম কম হয় তাহলে পরের দিনের অস্বস্তিটা খুব যন্ত্রণাদায়ক হয়। আর এটাও কিন্তু স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার আরেকটা কারণ। তাই স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করতে পর্যাপ্ত ঘুমান।

একটা কথা আছে না, 'Early to bed and early to rise'

তাই স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করতে এ কথাটি মেনে চলুন।

খেলাধুলা করুন

স্মৃতিশক্তি বাড়াতে খেলাধুলারও কোনো বিকল্প নেই। সারাদিনের অবসর সময়ে আপনি খেলতে বের হন। নিয়মিত খেলাধুলা করলে বিষণ্নতা ও উদ্বেগজনিত রোগ দূর হয়ে যায়। তাছাড়া নিয়মিত ব্যায়াম করুন। নিয়মিত খেলাধুলা ও ব্যায়াম না করলে আমাদের শরীরে বিভিন্ন রোগ বাসা বাঁধে। শরীরে রোগজীবাণু থাকলে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। এই রোগজীবাণু স্মৃতিশক্তিকে আস্তে আস্তে খেয়ে ফেলে। প্রতিদিন সকালে হাঁটতে বের হন। সকালের মুক্ত বাতাস ও স্তব্ধ প্রকৃতি আপনাকে সতেজ অক্সিজেন দিবে। ব্যায়ামের ফলে মস্তিষ্কে পচুর পরিমাণে অক্সিজেন ও গ্লুকোজ সরবরাহ হয়। স্মৃতিশক্তি বাড়াতে খেলাধুলা ও ব্যায়াম করাটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চিন্তামুক্ত থাকুন

স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো চিন্তা করা। আপনি যদি এই মানসিক চাপে থাকেন তাহলে আপনার স্মৃতিশক্তি অনেক লোপ পাবে। চিন্তামুক্ত থাকলে পূর্বের সকল জিনিস আপনার মনে থাকবে। আপনি যদি সবসময় চিন্তায় থাকেন তাহলে আপনি সেটা নিয়েই থাকবেন এবং আপনার স্মৃতিশক্তি কোনো কাজ করবে না। যারা আপনাকে মানসিক চাপ দেয় তাদের সঙ্গ একেবারেই পরিত্যাগ করুন। তাই স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সব সময় চিন্তামুক্ত থাকুন।

সব সময় হাসিখুশি থাকুন

পরিবারের লোকদেরকে পর্যাপ্ত সময় দিন। আপনি যদি সব সময় মনমরা হয়ে থাকেন তাহলে আপনার শরীরে উদ্বেগজনিত রোগ বাসা বাঁধবে। অনেকে মানসিক সমস্যায়ও ভোগেন। আপনি যদি সব সময় হাসিখুশি থাকেন তাহলে আপনার স্মৃতিশক্তি দ্বিগুণ কাজ করবে। তাই স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সবসময় হাসিখুশি থাকুন এবং পরিবারের লোকজনদেরকে পর্যাপ্ত সময় দিন।

অনুভূতি প্রকাশ করুন

হাসি-কান্না, রাগ, বিরক্তি সবকিছু প্রকাশ করুন। কোনোকিছু চেপে ধরে রাখবেন না। বই পড়া, ছবি আঁকা, খেলাধুলা করা ইত্যাদি করতে পারেন। তাছাড়া দাবা খেলা এবং সুডুকুও খেলতে পারেন। এতে আপনার মস্তিষ্কের চিন্তা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এমন কিছু যেটা আপনাকে উন্নত করবে এবং আপনি সেটা উপভোগ করবেন এবং সেটা চেপে না রেখে প্রকাশ করুন। তাছাড়া মস্তিষ্ককে কোনো একটা কাজে লাগান। মস্তিষ্ক যদি অলস পড়ে থাকে তাহলে সেটা আস্তে আস্তে মরিচা ধরার মতো হয়ে যাবে। তাই স্মৃতিশক্তি বাড়াতে কোনোকিছু চেপে না রেখে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করুন।

ধূমপান ত্যাগ করুন

যারা ধূমপায়ী তারা বিভিন্ন রোগে ভুগেন। ধূমপায়ীরা সব সময় মানসিক চাপে থাকেন। ধূমপানের ফলে আমাদের ফুসফুস মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একজন ধূমপায়ী ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি খুবই কম। ধূমপান হলো মরণব্যাধি। এটি কেবল স্মৃতিশক্তি কমাতে নয় বরং সকল রোগ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। ধূমপান আজই পরিত্যাগ করুন।

কোনো বিষয় জানতে হলে তার বিস্তারিত জানুন

আপনাকে যদি কোনো বিষয় জানতে দেওয়া হয় তাহলে সে বিষয়টির একদম খুঁটিনাটি থেকে শুরু করে সবকিছুই জানুন। আপনার কোনো বিষয় মনে রাখতে হলে সে বিষয়টির চিত্র, বর্ণনা, কাজ ইত্যাদি মাথায় রাখবেন। ফলে বিষয়টি আপনার মাথায় দীর্ঘস্থায়ী হবে। ■

৯ম শ্রেণি, কুড়িগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম

পছন্দের ছড়া

ইরাম আহমেদ

এখন শীতকাল। কাঁথা বা কম্বল গায়ে দিয়ে ছড়া, গল্প শুনতে কার না ভালো লাগে বলো তো। সাথে যদি থাকে নানি বা দাদি তবে তো সোনায় সোহাগা। তাদের ছন্দে বা সুরে কবিতা বলার ঢং মনে গেঁথে থাকে চিরকাল। নানি বা দাদি যখন গল্প বলে তখন মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে সবাই। কাছ থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না। আবার আমরা যখন মাত্র কথা বলা শিখি তখন মা-বাবা অনেক সুন্দর সুন্দর ছড়া আমাদের শিখান। কখনো ছড়া বলে মন ভোলায়, কখনো কান্না থামায়, কখনো ঘুম পাড়ায়। এসব ছন্দ বা ছড়া লেখাপড়ার ভিড়েও হারিয়ে যায় না। অনেক সময় আমাদের মা-বাবা নিজের অজান্তেই এসব গুনগুন করে বলতে থাকে। কান পাতলেই শুনতে পাবে তোমরা। এই ধরো খোকন খোকন ডাক পাড়ি; ঐ দেখা যায় তালগাছ; আয় আয় চাঁদ মামা; হাট্টিমা টিম টিম; দোল দোল দুলুনি; তাই তাই তাই মামা বাড়ি যাই; বাকবাকুম পায়রা –এই রকম আরো অনেক ছড়া। তখন এগুলো হয়ত তালে তালে অনেক পড়েছি কিন্তু কখনো কবির নাম বা দু-চার থেকে বেশি জানার আগ্রহ বোধ করিনি। কিন্তু বড়ো হয়ে যখন এ ছড়াগুলোর উৎস জানতে পারি তখন অদ্ভুত এক অনুভূতি দোলা দেয় মনে। চিৎকার করে জানাতে ইচ্ছে করে সবাইকে । আমি তোমাদের সাথে সেই রকম একটি ছড়ার পুরোটা শেয়ার করছি।

'হাট্টিমা টিম টিম' ছড়াটি ছোটোবেলায় পড়েনি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাংলা ভাষায় লেখা রোকনুজ্জামান খান (দাদাভাই)-এর এই ছড়াটি খুবই মজার। ১৯৬২ সালে লেখা এই ছড়াটি যে-কোনো বয়সের মানুষের পছন্দের একটি ছড়া। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো সবাই ছড়াটির ৪টি লাইন জানে কিন্তু সত্যিকার অর্থে আসল হাট্টিমা টিম টিম ছড়াটি মোট ৫২ লাইন। সবার জন্য আজকে তুলে ধরা হলো ৫২ লাইনের দীর্ঘ এই ছড়াটি।

হাট্টিমা টিম টিম

রোকনুজ্জামান খান

'টাটুকে আজ আনতে দিলাম
বাজার থেকে শিম
মনের ভুলে আনল কিনে
মস্ত একটা ডিম।
বলল এটা ফ্রি পেয়েছে
নেয় নি কোনো দাম
ফুটলে বাঘের ছা বেরোবে
করবে ঘরের কাম।
সন্ধ্যা সকাল যখন দেখো
দিচ্ছে ডিমে তা
ডিম ফুটে আজ বের হয়েছে
লম্বা দুটো পা।
উলটে দিয়ে পানির কলস

উলটে দিয়ে হাড়ি
আজব দু'পা বেড়ায় ঘুরে
গাঁয়ের যত বাড়ি।
সপ্তা বাদে ডিমের থেকে
বের হলো দুই হাত
কুপি জ্বালায় দিনের শেষে
যখন নামে রাত।
উঠোন ঝাড়ে বাসন মাজে
করে ঘরের কাম
দেখলে সবাই রেগে মরে
বলে এবার থাম।
চোখ না থাকায় এ দুর্গতি
ডিমের কি দোষ ভাই
উঠোন ঝেড়ে ময়লা ধুলায়
ঘর করে বোঝাই।
বাসন মেজে সামলে রাখে
ময়লা ফেলার ভাঁড়ে
কাণ্ড দেখে টাট্টু বারি
নিজের মাথায় মারে।
শিঙের দেখা মিলল ডিমে
মাস খানিকের মাঝে
কেমনতর ডিম তা নিয়ে
বসলো বিচার সাঁঝে।
গাঁয়ের মোড়ল পান চিবিয়ে
বলল বিচার শেষ
এই গাঁয়ে ডিম আর রবে না
তবেই হবে বেশ।
মনের দুখে ঘর ছেড়ে ডিম
চলল একা হেঁটে
গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে
ডিম গেল হায় ফেটে
গাঁয়ের মানুষ একসাথে সব;
সবাই ভয়ে হিম
ডিম ফেটে যা বের হলো তা
হাট্টিমাটিম টিম।
হাট্টিমাটিম টিম-
তারা মাঠে পারে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমা টিম টিম।'

বন্ধুরা, কেমন লাগল বলো তো। অনেকেই হয়ত পুরো কবিতাটি জানতে। কিন্তু তুলে ধরলাম তাদের জন্য, যারা জানে না। ■

দ্বাদশ শ্রেণি, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কাকরাইল, ঢাকা

উইকি লাভস আর্থ প্রতিযোগিতা -২০২০

রুবাইয়াত হোসেন

শখ থেকেই ছবি তোলেন বিপ্লব। সেই শখই তাকে টানে ছবি তোলার জন্য পথে-প্রান্তরে, বনবাদাড়ে, সমুদ্রে বা পাহাড়ে। হাজারো ছবির মাঝেই এই ছবি সবার মন কাড়ে। মাদার গাছের ফুলের মধ্যে তিন শালিকের খুনসুটি। লাখো ছবির মাঝে অসাধারণ এই ছবিটিকেই সেরা ছবি হিসেবে রায় দিয়েছেন আলোক চিত্রের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা উইকি লাভস আর্থ-২০২০ –এর বিচারকরা। ১ লাখ ৬ হাজার ছবির মধ্য থেকে বাংলাদেশের প্রতিযোগী তৌহিদ পারভেজের তোলা এই ছবিটি প্রথম স্থান অর্জন করে।

'উইকি লাভস আর্থ' প্রতিযোগিতায় তৌহিদ পারভেজ নিজের তোলা আরো কয়েকটি ছবি পাঠান। প্রথম পর্বে বাংলাদেশের প্রতিযোগীদের ১০টি ছবির মধ্যে তিনটিই ছিল পারভেজের। প্রথম, চতুর্থ ও ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। ১৭ই ডিসেম্বর একটি মেইলের মাধ্যমে খবর আসে তৌহিদের ছবিই বিশ্ব সেরা স্থান অর্জন করেছে। এক প্রতিবেদনে জানা যায়, তিনি আরো অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু এটা একেবারেই ভিন্ন রকম অনুভূতির। কারণ এটা শুধু তার নিজের অর্জন নয় এটা পুরো বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের সেরা অর্জন।

উইকি লাভস আর্থ ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতার অষ্টম আসর ছিল এটি। এতে মোট ৩৪টি দেশ অংশ নেয়। মে মাস থেকে জুলাই পর্যন্ত সময়ে ২ লাখ ৬ হাজার ছবি জমা পড়ে। আগস্ট মাসে প্রত্যেকটি দেশ থেকে সেরা ১০ টি ছবি পাঠানো হয় আন্তর্জাতিক বিচারকের কাছে। সেই দশ ছবির একটি এখন বিশ্ব সেরা ছবি। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন ইতালির আলোকচিত্রী

লুকা ক্যাসেলের মাছরাঙার মাছ ধরার ছবি। মজার ব্যাপার হলো এই আসরের তৃতীয় স্থান অর্জনকারীও বাংলাদেশের প্রতিযোগী নওয়াজ শরীফ। এছাড়া সপ্তম ও ১৫তম স্থানেও রয়েছেন বাংলাদেশের দুজন আলোকচিত্রী মেহেদী হাসান ও দিপু দত্ত।

তৌহিদ পারভেজ পড়াশুনা করেছেন নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে ইনস্টিটিউট অব স্টাডিজ আন্তর্জাতিক ব্যবসা বিষয়ে। সেখান থেকেই তার ছবি তোলা শুরু। ছবি তোলাই তার শখ। ছবি তুলতে গিয়ে কখনো গুইসাপ কখনো কুমিরের সামনে পড়েছেন। কখনো বন্য হাতির তাড়া খেয়েছেন। তারপরও তিনি সরে দাঁড়াননি এ কাজ থেকে। দেশের ৬১টি জেলায় ঘুরে ঘুরে ৪০০ প্রজাতির পাখির ছবি তুলেছেন তিনি।

তৌহিদের ঝুলিতে রয়েছে আরো কিছু আন্তর্জাতিক পুরস্কার। মস্কো ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জপদক, তুরস্কে ইন্টারন্যাশনাল ফটোগ্রাফি কনটেস্টে বিশেষ সম্মান এবং এবার ইন্টারন্যাশনাল ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় তৃতীয়, তুরস্কে ইব্রাহিম জামান ইন্টারন্যাশনাল ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতার সম্মাননাও সার্বিয়ায় ইন্টারন্যাশনাল স্যালন রিফ্লেকশন এ স্বর্ণপদক পেয়েছেন। তার তোলা ছবি যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্বস ইনসাইডার, অস্ট্রেলিয়ার ডাইপ্রেস, মেক্সিকোর ইউনিভিশন, লন্ডনের ডেইলি মেইলসহ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছে। ■

দ্বাদশ শ্রেণি, ইমপেরিয়াল কলেজ, আফতাবনগর, ঢাকা

ছোটোদের ছড়া

শীতের ছড়া

গোলাম সাকলায়েন

সূর্যটা আজ যায় না দেখা
কুয়াশা ভরা ঘাসে
তাই তো আমার হাত-পাগুলো
ঠান্ডায় জমে আসে।
পুরনো পাতা ঝরে পড়ে
নতুন পাতার আশে
পিঠাপুলির গন্ধ ভাইরে
বাতাসে ভেসে আসে।
গাছিরা সব হাঁড়ি বাঁধে
ওই খেজুরের গাছে
সরষে ক্ষেতের ফুলে ফুলে
মৌমাছিরা নাচে।

দ্বাদশ শ্রেণি, বাগাতিপাড়া সরকারি কলেজ, নাটোর

নতুন রূপে আকাশ

লাবিবা তাবাসসুম রাইসা

রাতের আকাশ তারায় ভরা
দৃশ্য এইসব নজর কাড়া
চাঁদটা দেখার মতো
আশেপাশে তারা শত শত
জীবন আমার হচ্ছে ধন্য
এসব দৃশ্য দেখার জন্য
চাঁদের জোছনায় বসে থেকে
বাতাসগুলো ধরে জেঁকে।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা

বছর এল

মো. তৈয়বুর রহমান ভূঁইয়া

কৃষ্ণচূড়ায় ময়না,শালিক
শিমুল গাছে টিয়ে,
বলছে সবাই বছর এল
প্রাণের পরশ নিয়ে।
তাই তো দোয়েল গান ধরেছে
ফিঙে নাচে তাধিন,
আজকে সবার আনন্দ খুব
আজকে সবাই স্বাধীন।
সঙ্গী হলো বুলবুলি আর
ছোট্ট পাখি টুনটুন,
তারাও আজ মনের সুখে
গাইছে আহা গুনগুন!

একাদশ শ্রেণি, সরকারি শহীদ আসাদ কলেজ
শিবপুর, নরসিংদী

নতুন বই

মিম আক্তার

নতুন বই হাতে নিয়ে
লাগছে অনেক ভালো
সব আঁধার কেটে গিয়ে
ফুটবে নতুন আলো।

যাব আবার সবাই মিলে
হাতে নিয়ে নতুন বই
সবার সাথে মেতে উঠে
করব অনেক হইচই।

৮ম শ্রেণি, শরিফাবাদ দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, নীলফামারি

নারীর ক্ষমতায়ন: কন্যাশিশুর সাফল্য

করোনাযোদ্ধা ঊর্মি

জান্নাতে রোজী

ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলার ঊর্মি এখন করোনাযোদ্ধা। হাত ধোয়াসহ স্বাস্থ্যবিধি, কাশির শিষ্টাচার, ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নিয়ম এবং এই মহামারি প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে প্রতিনিয়ত সচেতন করে চলেছেন তার এলাকার মানুষদের। মাস্ক পরার উপকারিতা, হাত ধোয়ার নিয়ম, সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা সম্পর্কে একজন দক্ষ কর্মী যেভাবে মানুষকে সচেতন করে ঠিক সেভাবেই প্রতিটি ঘরে গিয়ে সচেতনতা তৈরি করছেন ছোট্ট বন্ধুটি। গত এপ্রিল মাস থেকেই নিজ ইচ্ছায় এ কাজই করে চলেছেন।

সাধারণত বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রামের মানুষদের বাড়িতে পাওয়া যায়। তাই এ সময়টাকেই জনসংযোগের জন্য বেছে নিয়েছেন ঊর্মি। বিশেষ করে গ্রামের নারীদের এক প্রকার হাতে-কলমেই হাত ধোয়ার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ঊর্মি। তার এ কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে এলাকার অনেক ছেলেমেয়ে যোগ দিয়েছে তার সাথে।

সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মান তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ঊর্মি। করোনাকালে কলেজ বন্ধ। বাড়িতে থাকতে গিয়ে এক পর্যায়ে তার মাথায় ভাবনা আসে কীভাবে ভূমিকা রাখা যায় এ মহামারি প্রতিরোধে। তখনই পড়ালেখার পাশাপাশি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষকে সচেতন করার বিষয়টি মাথায় আসে। এরপরই শুরু হয় ঊর্মির করোনার বিরুদ্ধে পথচলা। ■

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

ভ্রাম্যমাণ বাসের স্কুল

বাসের গা জুড়ে কতকিছু আঁকা– ছবি, পেনসিল, কম্পাস, স্কেলসহ আরো কত কী। চেনা এসব শিক্ষা উপকরণের মধ্যে রয়েছে স্কুল পড়ুয়া শিশুর ছবি, পিঠে স্কুল ব্যাগ, মুখে একরাশ নির্মল হাসি। বাসের অপর পাশেও হাস্যোজ্জ্বল এক

শিশুর ছবি রয়েছে। তার হাতে বইয়ের সাথে আছে ইলেকট্রিক ট্যাবলেট যা সবার দৃষ্টি কাড়ে। বাসটি দেখে প্রথমে স্কুলবাস মনে হলেও ভেতরের গুঞ্জন, খুঁনসুটি, পড়ার আওয়াজ স্বরে অ,স্বরে আ ইত্যাদিতে সে ভুল ভাঙে। রঙিন এই বাসটি আসলে একটি স্কুল। কী অবাক হচ্ছ! হ্যাঁ বন্ধুরা, বাসটি ছয় চাকার। নাম 'চাকার স্কুল'। এর ভেতরটা সাজানো শ্রেণিকক্ষের মতো। সেখানে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। স্বল্প আয়ের পরিবারের শিশুরা এই বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এই স্কুল বাসটি রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে পড়ায় বলে এর নাম 'চাকার স্কুল'। বাসের ভেতরে আসনের বদলে রয়েছে শিক্ষার্থীদের বসার স্থান। রয়েছে হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার, হাজিরা খাতা, গ্রন্থাগার, বই, খেলনা, টিভি ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের হাতে দেওয়া হয় ট্যাবলেট কম্পিউটারও। বর্তমানে করোনাকালে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অল্পসংখ্যক শিশুদের পড়ানো হচ্ছে। এই চাকার স্কুলের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া শিশুদের স্বপ্নের হাতেখড়ি হচ্ছে।

স্বর্ণপদক পেল 'ইঁদুর'

স্বর্ণপদক পেল ইঁদুর! এ আবার কীভাবে সম্ভব? হ্যাঁ বন্ধুরা, ঘটনা কিন্তু সত্যি। তবে যেনতেন কাজের জন্য নয়, বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য স্বর্ণপদক পেয়েছে ইঁদুরটি। ৭ বছর বয়সি আফ্রিকান ইঁদুরটির নাম মাগওয়া। সে তার পেশা জীবনে ৩৯টি স্থলমাইন ও ২৮টি অবিস্ফোরিত গোলা শনাক্ত করেছে। দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়ার দেশ কম্বোডিয়ার অতি ঝুঁকিপূর্ণ স্থলমাইন শনাক্ত করে সে। এগুলো অপসারণের মাধ্যমে অনেক মানুষের প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করেছে এ ক্ষুদে প্রাণীটি। যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রাণী বিষয়ক দাতব্য সংস্থা পিপলস ডিসপেনসারি ফর সিক অ্যানিমেলস (পিডিএসএ) এই পদক দিয়েছে। এর আগে অন্য ৩০টি প্রাণী এই সাহসিকতা পুরস্কার পেয়েছে। মাগওয়া অনেক ছোট্ট ও হালকা-পাতলা হওয়ায় সে মাইনের ওপর দিয়ে হাঁটতে পারে। সে যখন কোনো বিস্ফোরক খুঁজে পায় তখন সঙ্গে থাকা মানুষ সহকর্মীকে সতর্কবার্তা প্রদান করে।

রং বেশি দেখতে পায় হামিংবার্ড

রঙের এই দুনিয়ার চারদিকে কত রং। মানব চোখ লক্ষ লক্ষ রং দেখতে পায়। মানুষের চেয়ে বেশি রং কি কেউ দেখতে পারে? হ্যাঁ, পারে বন্ধুরা। এতদিন জানতাম কুকুর মানুষের চেয়ে বেশি দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ও রং দেখতে পায়। তবে হামিংবার্ড মানুষের চেয়ে ১০ লক্ষ গুণ বেশি রং দেখতে পায়। হামিংবার্ড পৃথিবীর সবচেয়ে ছোটো পাখি। হামিংবার্ডদের চোখে একটি চতুর্থ রেটিনা কোণ আছে যা অতিবেগুনি রশ্মি শনাক্ত করতে পারে। এটি তাদেরকে প্রতিটি রঙের চারটি ডাইমেনশন (4D) দেখতে সাহায্য করে। যেখানে মানুষ কেবল রঙের তিনটি ডাইমেনশন (3D) দেখতে পারে। মানুষ যেসব রং কল্পনাও করতে পারে না, সেটাও এই পাখিটি দেখতে পায়। তাই গবেষকদের মতে,পাখি এবং অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষকে বর্ণহীনই বলা চলে।

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. বাংলাদেশের একটি জেলা, ৪. সমুদ্র, ৫. সৈন্য, ৮. আকৃতি, ১০. পানি রাখার এক ধরনের পাত্র, ১.মৃত্যু পর্যন্ত

উপর-নিচ: ১.জাতিসংঘের একটি ভাষা,২.আম,৩.সুমিষ্ট পানীয় বিশেষ,৬.পায়রা, ৭.শরীর,৯.লিখতে অক্ষম

১.				২.		৩.	
				৪.			
৫.	৬.						
					৭.		
৮.			৯.				
			১০.				
		১১.					

ছক মিলাও

শব্দধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যেসব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: নির্বাসন, দাগ, বিনির্মাণ, পররাষ্ট্র সচিব, বিরাগ, ধারাপাত, ছবি, বচন, চট, দান, রাজা

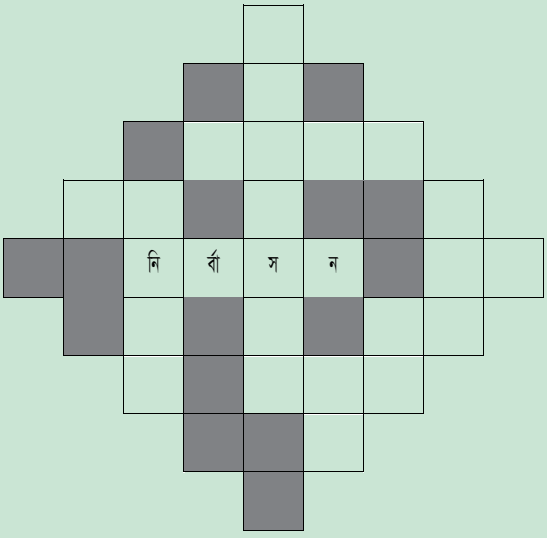

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৩	*		-	৫	=	
+		+		+		+
	*	২	-		=	৯
-		-		-		-
৭	+		-	৪	=	
=		=		=		=
	*	১	*		=	৮

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৭৯		৬৩			৬০	৪৫		৪৩
	৭৭		৬৫		৫৯		৪৭	
৮১		৭৫		৫৭		৫৩		
	৭৩		৬৭		৫৫			
৭১		৬৯		৩৩		৫১	৫০	
	১১		১৩		৩৫		৩৭	৩৮
৯		১		৩১		২৯		২৫
	৭			১৮		২৮	২৭	
৫		৩	১৬		২০			২৩

মুজিববর্ষের ঘোষণা

বন্ধুরা, তোমাদের জন্য সুখবর। নবারুণের 'বুদ্ধিতে ধার দাও' এতদিন খেলে উত্তর পাঠিয়েছ কিন্তু কোনো উপহার পাওনি। এপ্রিল ২০২০ সংখ্যা থেকে শুরু হয়েছে উপহারের পালা। সঠিক উত্তর দাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ীকে দেওয়া হবে ৫০০ (পাঁচশত) টাকার প্রাইজবন্ড। এজন্য নবারুণ পত্রিকার পাতা (ফটোকপি প্রযোজ্য নয়) পূরণ করে বন্ধ খামে পাঠাতে হবে। খামের ওপর অবশ্যই লিখতে হবে 'বুদ্ধিতে ধার দাও'। পাঠাবে এই ঠিকানায়—

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

বুদ্ধিতে ধার দাও

ডিসেম্বর ২০২০ -এর সমাধান

শব্দধাঁধা

					সা		
					ভা	র	ত
এ	ক	ত্রি	শ	বা	র		
কে						ভু	
খ						টা	কা
ন্দ		সু	ন্দ	র	ব	ন	
কা							
র							

ছক মিলাও

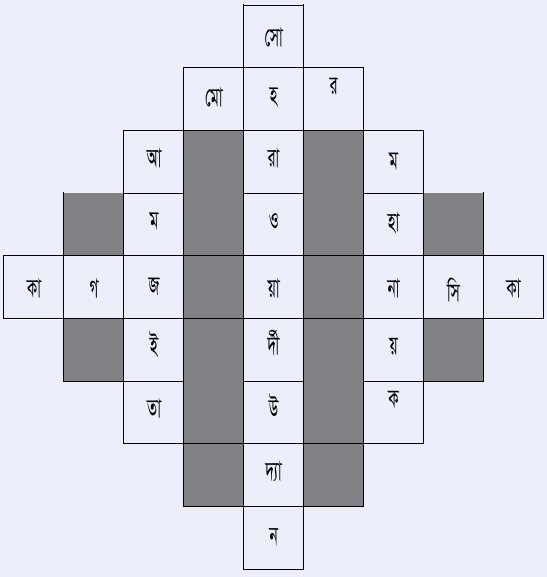

ব্রেইন ইকুয়েশন

২	*	৩	-	১	=	৫
+		*		*		+
৫	*	২	-	৪	=	৬
-		-		-		+
৪	*	১	-	২	=	২
=		=		=		=
৩	*	৫	-	২	=	১৩

নাম্ব্রিক্স

৫	৬	৯	১০	১১	৭২	৭১	৭০	৬৯
৪	৭	৮	১৩	১২	৭৩	৮০	৭৯	৬৮
৩	২	১	১৪	১৫	৭৪	৮১	৭৮	৬৭
২৪	২৩	২০	১৯	১৬	৭৫	৭৬	৭৭	৬৬
২৫	২২	২১	১৮	১৭	৬০	৬১	৬২	৬৫
২৬	৩৫	৩৬	৩৯	৪০	৫৯	৫৮	৬৩	৬৪
২৭	৩৪	৩৭	৩৮	৪১	৫৬	৫৭	৫২	৫১
২৮	৩৩	৩২	৪৩	৪২	৫৫	৫৪	৫৩	৫০
২৯	৩০	৩১	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯

মোহাম্মদ ইউসুফ তুর্য, ৫ম শ্রেণি, জুনিয়র এইড, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

ইহসানুল হক সিফাত, ৩য় শ্রেণি, মুগদা আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

অ্যাডহক প্রকাশনা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

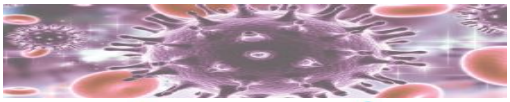

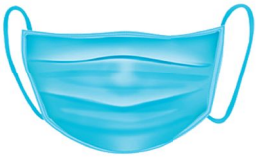

করোনার বিস্তার প্রতিরোধে

নো মাস্ক নো সার্ভিস

মাস্ক নাই তো সেবাও নাই

মাস্ক ছাড়া সরকারি-বেসরকারি
প্রতিষ্ঠানে কোনো সেবা মিলবে না

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-45, No-7, January 2021, Tk-20.00

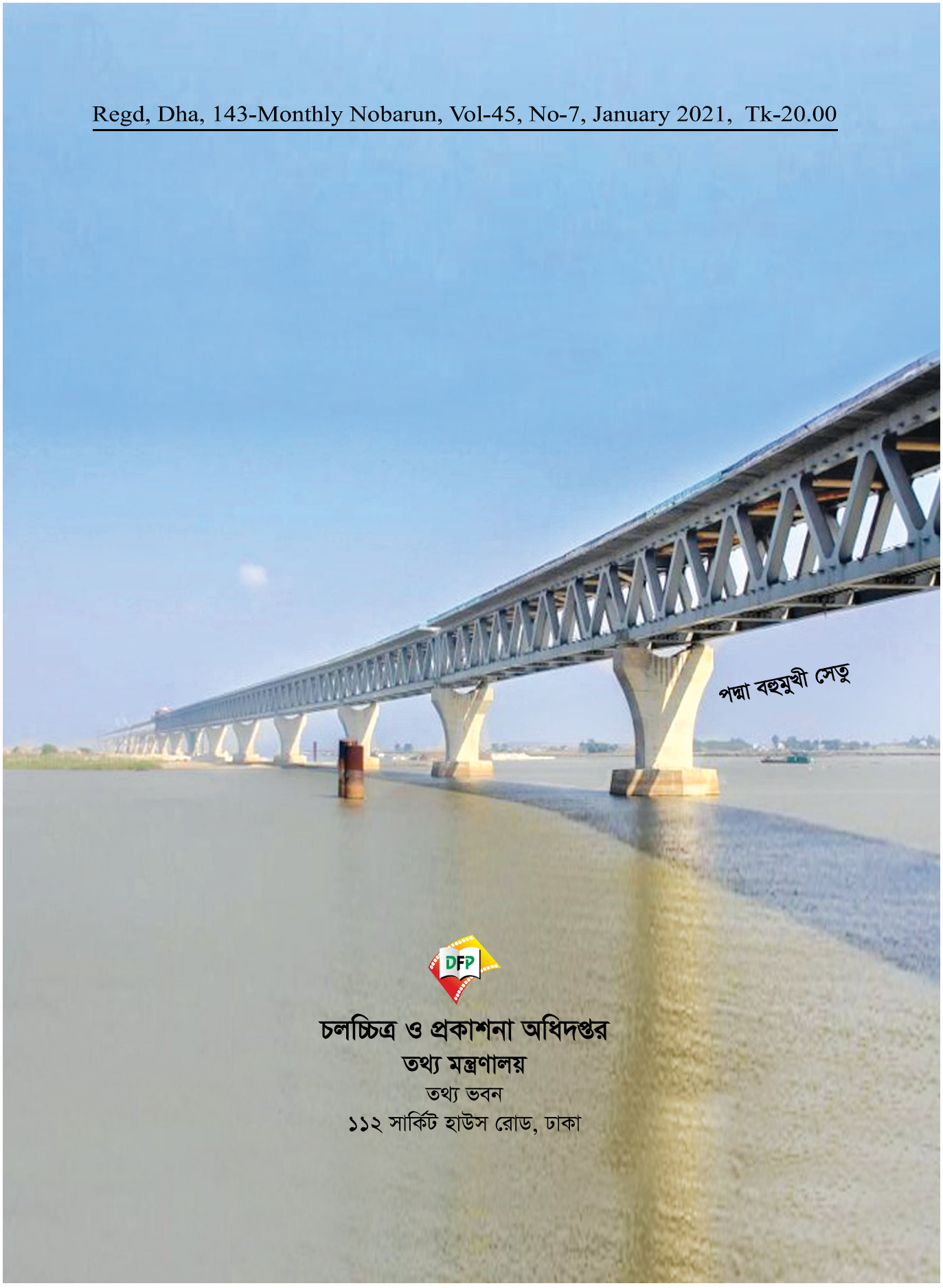

পদ্মা বহুমুখী সেতু

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা